পিয়াল

বাৎসরিক সংকলন– ২০২৪

রাণী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ
ঝাড়গ্রাম

‘‘আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহলভরে --
আজি হতে শতবর্ষ পরে।’’

প্রকাশক - রাণী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ

প্রকাশকাল - হেমন্ত, ২০২৪

সম্পাদক - ড. শুভাশিস আচার্য (সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ)

সহ-সম্পাদক - ড. অমৃতা চক্রবর্তী (সহকারী অধ্যাপক, শারীরবিদ্যা বিভাগ)
প্রিয়াংকা সেন (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ)
পম্পা হেম্ব্রম (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ)

সহযোগিতায় - অনুপমা ঘোষ (দ্বিতীয় সেমেস্টার, সংস্কৃত বিভাগ)
দিশা পোড়েল (চতুর্থ সেমেস্টার, স্নাতক সাধারণ)
দীপ্তি কুইল্যা (দ্বিতীয় সেমেস্টার, দর্শন বিভাগ)

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ - প্রিয়াংকা সেন (সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ)

মুদ্রণ - ঋষিপ্রেস, কদমকানন, ঝাড়গ্রাম, মোঃ-9083817379

Tel No.- 03221-255022/ 258700
Website: https://jrc.ac.in
Email: jhargramrajcollege@gmail.com

Office of The Principal
Jhargram Raj College, Govt. of West Bengal
P.O. & Dist.- Jhargram, Pin-721507

From: The Principal, WBSES
Jhargram Raj College

Date- 1st November, 2024

Message

I am delighted to note that Rani Indira Debi Government Girls' College is going to publish its Annual Magazine "PIYAL".

A college magazine reflects the consolidated efforts of the faculties, students and all stakeholders, and it can be used to record events, sweet memories and creative writings. I am sure it will also exhibit the latent talents of the teachers and the students as storytellers, poets, catalysts and so on.

I extend my warm wishes to the Principal, Teachers and Students of Rani Indira Debi Government Girls' College to continue the journey to excellence.

01/11/2024

The Principal,
Jhargram Raj College

Principal
Jhargram Raj College
Jhargram, West Bengal- 721507

To
The Principal/Officer-in-Charge,
Rani Indira Debi Government Girls' College, Jhargram

Government of West Bengal
Labour Department
Directorate of Employment, West Bengal
Office of the District Employment Exchange, Jhargram
4th Floor, C Block, New Integrated Collectorate Building,-Jhargram, Dist:- Jhargram

District Employment Exchange Jhargram

মাননীয় শ্রী সুশীল কুমার বর্মন
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
রানী ইন্দিরা দেবী সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়
ঝাড়গ্রাম

মহাশয় ,

আপনার অধিনায়কত্বে, রানী ইন্দিরা দেবী সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপিকা ও অধ্যাপকদের পরিচালনায় বার্ষিক পত্রিকা "**পিয়াল-২০২৩-২৪**" খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে বলে শুনলাম।আপনাদের কলেজে বিগত কয়েক বছরে, ক্যারিয়ার টক সহ বিবিধ উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সময়ে,এই কলেজের ছাত্রীদের ব্যতিক্রমী প্রতিভা ও প্রচেষ্টা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপনাদের কলেজের সঙ্গে যুক্ত সবাই যে ভাবে ছাত্রীদের , সন্তান সুলভ আন্তরিকতায় বড় করছেন, ও তাদের সার্বিক বেড়ে ওটা, প্রতিভার বিকাশ ও কর্মমুখী করে তোলার চেষ্টা করছেন, তা এক কথায় অনন্য।আপনার প্রতিষ্ঠিত ও আপনার কলেজের অধ্যাপিকা ও অধ্যাপক দের দ্বারা পরিচালিত, শবর গ্রামের শিশুদের গৃহ শিক্ষার উন্নতির জন্যে "**চুনি কোটাল পাঠশালা** ", সম্প্রদায় উন্নয়ন কর্মসূচির ধ্রুবতারা হিসেবে আজ সুপরিচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী পিয়াল সংখ্যা টি ও আপনাদের কলেজের ছাত্রীদের ব্যতিক্রমী লেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এই পত্রিকা প্রকাশের জন্যে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

অ: দ ২৮.১০.২০২৪

অরুণাভ দত্ত
উপ -অধিকর্তা
জেলা কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র
ঝাড়গ্রাম

From,
Dr. Dipak Kumar Bara Panda,
Ph.D
Curator
Asutosh Museum of Indian Art
University of Calcutta.

ASUTOSH MUSEUM OF INDIAN ART
UNIVERSITY OF CALCUTTA
87/1, COLLEGE STREET
KOLKATA – 700073
Tel: (033) 2241-0071/2241-4984
Fax: 91-033-2241-3222
Email: curator@caluniv.ac.in

Date: 02/11/2024

To
Susil Kumar Barman
Officer-in-Charge
Rani Indira Debi Government Girls' College

I want to express my heartfelt appreciation for the exemplary efforts of the Rani Indira Debi Government Girls' College in publishing the latest edition of the college magazine 'Piyal'.

The magazine is a testament to the talent, creativity, and dedication that define an institution. The articles, poems, artwork, and photographs not only reflect the diverse skills of the students and staff but also provide a glimpse into the college's vibrant academic and cultural life.

I am confident that the edition will leave an indelible impression on its readers and contribute significantly to the institution's legacy. I wish you all continued success in your future endeavours.

Warm regards,

Dr. Dipak Kumar Bara Panda,
University Curator,
Asutosh Museum of Indian Art,
University of Calcutta
2nd December, 2024

Telephone : 2241 2216
E-Mail : info@goenkacollege.net
principal@goenkacollege.net

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

GOENKA COLLEGE OF COMMERCE & BUSINESS ADMINISTRATION

210, BIPIN BIHARI GANGULY STREET, KOLKATA - 700 012
Website : www.goenkacollege.net

Ref. No. .... Dated.............................20

To
Sushil Kumar Barman
Officer-in-Charge
Rani Indira Debi Government Girls' College
Jhargram, WB

Letter of Appreciation

Sir,

I am writing to express my sincere appreciation for your outstanding effort and contributions to publish the annual magazine "PIYAL 2024", Your commitment to excellence and dedication to your work are truly remarkable. Kindly accept my best wishes.

Warm regards,

Principal 30/10/24
Goenka College of Commerce & Business Administration

From the Principal's Desk

Susil Kumar Barman
Officer-in-Charge
Rani Indira Debi Government Girls' College

Nestled in the lush green forests of Junglemahal, Jhargram is rich in culture and heritage. Nearing the end of my professional life, countless images crowd my mind, and I cannot help but wistfully recall my first day in Jhargram. Little did I know that I was going to spend decades here and become a part of this land and its people. Looking back on the wonderful memories, the realization has dawned on me that teaching is more about learning than teaching. Not only have I gained considerable knowledge about the people and their way of life here but I have also learnt about the landscape of the region and also found inspiration for my research on the remnants of Jainism in the region.

As a young college which just completed only a decade of its existence, we have had an enormous task before us in setting up an entire college with limited staff and teachers. Yet, we left no stone unturned and continued to strive forward as a spirited team at Rani Indira Debi Government Girls' College.

Once again, *Piyal* presents us with a glimpse of the immense talent and creativity of our students and faculty members. I offer my heartfelt gratitude to everyone for their cooperation in all endeavours.

I wishing my team many more successes in the future.

সম্পাদকীয়

হেমন্তিকার শিশির ঝরে, ঝরা পাতার 'পরে
গতায়ু সব রিক্ততা শুভাগমের তরে ।
বিদায় বাণীর সুরে প্রবীণ পিয়াল ঝুরে
দুঃখ নেই, হাসবে আবার নবীন জীবন ভোরে ।।

পাতায় পাতায় ভরেছে তার কবি- ছবির রেখা,
নতুন দেহে ফুটেছে আজ সবুজ হাসির শোভা ।
সেই শোভাতেই মুগ্ধ মোরা চোখ যায় না ফেরা,
স্মৃতিমেদুর- কথকতা, রঙিন ভাবে মোড়া ।।

ক্রমবিকশিত, পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত পিয়ালের তৃতীয় সংখ্যা মুগ্ধ করেছে আমাদের। পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকা কাঁচা-পাকা কালির আঁচড় এভাবেই বারংবার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাক পিয়ালের সম্ভাবনাময় পদধ্বনিকে। ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে উঠে রস গ্রহণই আমাদের পাথেয়।

Details of IQAC members

Position	Name	Designation
Chairperson	Susil Kumar Barman	Officer-in-Charge
Coordinator	Dr. Joheb Islam	Assistant Professor, Department of Sociology
Teacher representatives	Mousumi Patra Rashmi Beck Dr. Sutapa Das Nibedita Debnath	Assistant Professor, Department of Sociology Assistant Professor, Department of Sociology Assistant Professor, Department of Sociology Assistant Professor, Department of Sociology
Student representative	Rakhi Jana	Political Science (Hons)
Student alumni	Sweta Makur	Bengali (Hons) [2018-19]
Senior Administrative Officer	Dr. Debnarayan Roy	Principal, Jhargram Raj College
Local Educationist	Swami Vedpurushananda	Secretary, Ramkrishna Mission, Jhargram
	Dr. Dipak Ranjan Mandal	Ex-DPI, Ex-VC, Sidho Kanho Birsha University
Local Industrialist/Employer	Madhusudan Karmakar	--------------

Details of faculties

Departments	Faculties	Designation
Bengali	Pampa Hembram	Assistant Professor and Head
	Mousumi Patra	Assistant Professor
	Dr. Suvasis Acharya	Assistant Professor
English	Priyanka Sen	Assistant Professor and Head
	Madhumita Miswas	Assistant Professor
Sanskrit	Naznin Mullick	Assistant Professor and Head
	Dr. Pritam Ghosal	Assistant Professor
History	Rashmi Beck	Assistant Professor and Head
	Dr. Sonia Mondal	Assistant Professor
	Rahul Saikh	Assistant Professor
Political science	Deblina Mukherjee	Assistant Professor and Head
Philosophy	Dr. Soumita Choudhury	Assistant Professor and Head
	Nibedita Debnath	Assistant Professor
Sociology	Dr. Suchandra Ghosh	Assistant Professor and Head
	Dr. Joheb Islam	Assistant Professor
	Dr. Sreyashi Ghosh	Assistant Professor
	Dr. Debarati Chakraborty	Assistant Professor
	Shamayeeta Ghosh	Assistant Professor
	Smita Chakraborty	Assistant Professor
Physiology	Dr. Sutapa Das (ph.d.)	Assistant Professor and Head
	Dr. Amrita Chakraborty	Assistant Professor
Zoology	Sanatan Murmu	Assistant Professor and Head

Details of office-staff

Office staff	Designation
Debarun Dutta	Lower Division Clerk cum Cashier
Syed Munis Mukulesh	Cashier
Bablu Hansda	Library Assistant
Saikat Ghosh	Data entry operator
Rakesh Sahoo	Data entry operator
Rajib Bera	Data entry operator
Chandan Sing	Data entry operator
Trilochan Pratihar	Security Guard
Manish Chakraborty	Security Guard
Shibaprasad Ghosh	Security Guard
Tapas Pal	Security Guard
Rakhal Mukhi	Karmabandhu
Droupadi Sen Digar	Karmabandhu

Message
From the Principal's Desk
সম্পাদকীয়
Details of IQAC Member
Details of faculties
Details of office staff

সূচিপত্র

পত্রাঙ্ক

পদ্য

পথপ্রদর্শক	–	অর্চনা ডাব	১৭
প্রতীকী	–	স্মিতা চক্রবর্তী	১৮
ঝাড়গ্রামের রূপ	–	ঐশ্বর্য্য মাহাত	১৮
এ কেমন গণতন্ত্র	–	রাহুল সেখ	১৯
রানীবালার গল্প	–	মালতী মুর্মু	১৯
নারী স্বাধীনতা	–	শ্রেয়া পাত্র	২০
জীবন	–	রিয়া সিংহ	২০
শীতের কবিতা	–	বর্ণালী সিংহ	২১
আমাদের কলেজ	–	অঞ্জলি পাত্র	২১
রামমোহন	–	ঋতু মাইতি	২১
পরিস্থিতি	–	সুস্মিতা ঘোষ	২১
বন্ধু মানে	–	প্রিয়াঙ্কা খিলাড়ি	২২
শিক্ষার পরিহাস	–	ঋতু মাইতি	২২
শরৎকাল	–	ঝুম্পা পাল	২২
সচেতন হও	–	মালতী মুর্মু	২৩
কিছু মেয়ের ভাবনা	–	ধরিত্রী মুর্মু	২৩
বিঁদি সাধু রামচাঁদ মুর্মু	–	পম্পা হেম্ব্রম	২৪

গদ্য

ঐরাবতের আগমন	–	সনাতন মুর্মু	২৬
অর্ন্তবিবাহে অন্তরায় ঃ সংবিধান ও সমাজের নজরে বিবাহ	–	ড. সুচন্দ্রা ঘোষ	২৯
তাম্রবাহিনী তারেফেনি	–	সুশীল কুমার বর্মন	৩২
এলেম নতুন দেশে	–	ড. অমৃতা চক্রবর্তী	৩৮
প্রথম কলেজ যাওয়ার অভিজ্ঞতা	–	ময়না নায়েক	৪৪
‘পিয়াল’ তোমায় দিলাম খোলা চিঠি	–	সুস্মিতা ঘোষ	৪৫
অবলম্বন	–	স্বাগতা মল্লিক	৪৬
The Bittersweet Bond	-	Rachana Dey	50
The Cost of Greed	-	Diya Rajak	51
Humanities in Twenty First Century	-	Ananya Mahata	52

অঙ্কন

সাবিত্রী পট্টনায়ক	৫৪
প্রিয়া দাস	৫৫
রুমা আঢ্য	৫৭
শ্রুতি সরকার	৫৮
দেবস্মিতা ঘোষ	৫৯
শ্রেয়া রাউত	৬০
দিশা পোড়েল	৬১
শ্রেয়া পাত্র	৬২
প্রিয়াঙ্কা খিলাড়ি	৬৪

পথপ্রদর্শক

অর্চনা ডাব
দ্বিতীয় সেমেস্টার
দর্শন বিভাগ

তাকে দেখে গর্ব হতো, বাড়তো বুকের বল,
আমিও একদিন তার মতো ধরবো শিক্ষার হাল

সকল ছাত্র পড়বে এসে আমার আলয় মাঝে
শিক্ষা নিয়ে বড়ো হয়ে বাঁচবে বিশ্ব কাজে।

আমার শ্রদ্ধার মানুষ পবিত্র মাহাতো মহাশয়,
তাঁর কাছেই দীক্ষা নিয়ে গড়বো বিদ্যার আলয়।

গর্ব করে শিক্ষক বলবেন, ‘‘এই তো সমাজ চায়!
এভাবেই এগিয়ে যাও, ছোট্ট ছোট্ট পায়ে।’’

সেই দিনটির আশায় আমি দিন গুনতে থাকি,
স্বপ্ন যেন আজও আমায় করছে ডাকাডাকি।

সফলতা পাবোই একদিন, কথা দিচ্ছি আমি!
উন্নতির শীর্ষ চূড়ায় দেখা হবেই জানি।

ওই দিন স্যার প্রণাম করে নেবো আশীর্বাদ,
আপনার কাছে এই কথা দিলো অর্চনা ডাব।

প্রতীকী

স্মিতা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

একদিন দেখি আমি একদল মেয়ে,
ডুলুং নদীর পাড়ে চলেছে ধেয়ে।

কাঁধেতে পড়ার ব্যাগ, স্বপ্নালু চোখ,
তারা চায় সমাজটা সুন্দর হোক।

শিক্ষার পথে করে তারা সংগ্রাম,
ভেঙে দিয়ে সব বাধা, পায়ে ফেলে ঘাম।

স্বাধীন স্বপ্ন যেন মেয়েদের চোখে
আত্মবল, পরিশ্রম দিয়ে অন্যায় রোখে।

জানে তারা সম্মুখে পথ বহুদূর !
কলমেতে লিখবেই বিজয়ের সুর।

নারী নয় দুর্বল, শক্তির প্রতীক!
আগামীতে তারা জয়ী হবে ঠিক।

ঝাড়গ্রামের রূপ

ঐশ্বর্য্য মাহাত
প্রথম সেমেস্টার
সংস্কৃত বিভাগ

মহুলের প্রান্তরে ফুরিয়ে যায় বেলা,
শহরের কোলাহলে হেথা শান্তির মেলা।
শাল-সবুজে ঢেকে যায় তার প্রতি কোণ,
ডুলুং-এর রিনিঝিনি, ভরে যায় মন।

সহজ মানুষের হাসি মেলে সবখানে,
প্রকৃতির ছোঁয়া মাটির সোঁদা ঘ্রাণে।
বাঁশের বাঁশরিতে প্রকৃতির কলতান,
সাঁওতাল যুবতীর নেচে ওঠে প্রাণ।

অরণ্য-আদিমতা, মদির তরঙ্গ
ঝাড়গ্রাম যেন সেই মুক্ত বিভঙ্গ!
ঐতিহ্যের গৌরব, সংস্কৃতির গাথা
জীবন্ত কবিতা এক, চিরন্তন আশা।

এ কেমন গণতন্ত্র ?

রাহুল সেখ
সহকারী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ

মন্ত্র যেন ঘন্টা হল, তন্ত্র যেন যন্ত্র হল,
গণ যখন বন্দী হল, স্বৈরাচারী বৃদ্ধি পেল।
অরাজকতা শুরু হল
মানুষ কেমন হয়ে গেল!
নির্বাচনী ঘন্টাধ্বনি হঠাৎ করে বেজে গেল
রক্তধারা শুরু হল, সবাই যেন ভুলে গেল!
গণতন্ত্র নামক তন্ত্র ছিল,
মানুষ কেমন হয়ে গেল!
দায়িত্ব যেন বদলে গেল, তেল চাটুনি শুরু হল,
সবাই কাজ ভুলে গেল, গণতন্ত্র ধোঁকা খেল।
ষড়যন্ত্র শুরু হল
মানুষ কেমন হয়ে গেল!
মুক্তির জন্য সংগ্রাম ছিল, মৃত্যুর কত মিছিল ছিল!
তবেই না গণতন্ত্র সমাজে আজ প্রতিষ্ঠা হল।
এ কেমন গণতন্ত্র? আবার হত্যা শুরু হল।
মানুষ কেমন হয়ে গেল!
সিংহাসন তোমার অটুট ছিল, তবুও লড়াই শুরু হল।
মানুষ তোমার পক্ষে ছিল, বিতৃষ্ণা কেন বৃদ্ধি পেল!
ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙা হল,
মানুষ কেমন হয়ে গেল!
জয়-ই যখন লক্ষ্য ছিল, ভোটের কেন দরকার হল!
মানুষ শুধু ধোঁকা খেল, তোমার তন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল।
গণতন্ত্রের মৃত্যু হল
মানুষ কেমন হয়ে গেল!
বিশ্ব আজ দেখে নিল, গণতন্ত্র পাল্টে গেল
নেতারা সব বদলে গেল, সবাই যেন ভুলে গেল!
মায়ের হাহাকার শুরু হল।

রানীবালার গল্প

মালতী মুর্মু
পঞ্চম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

আমার চেনা গ্রাম
কী জানি তার নাম!
সেথায় আছে পাঠশালা
পড়তে যায় রানীবালা।
রানীবালা লক্ষ্মী মেয়ে
ড্যাবড্যাবিয়ে দেখে চেয়ে
পন্ডিতমশাই ডাকলে জোরে
দু-চোখ বেয়ে জল ঝরে।
সেই রানী আজ বড় হয়ে
পড়াশুনোই করলো যেচে
দশের-দেশের সেবা করে
ডাক্তার হয়ে রোগী দেখে।
মানুষ হয়ে মানুষ চেনে
জাতপাত মানে না।
দুঃখীর বন্ধু রানী আজ
নিজের কথা ভাবে না।

নারী স্বাধীনতা

শ্রেয়া পাত্র
প্রথম সেমেস্টার
ইংরেজী বিভাগ

সমাজের বাঁধনে বন্দী নারী
স্বপ্ন তবু আকাশ ছোঁয়া,
আশা বুকে পাহাড়-প্রমাণ
স্বাধীনতার গন্ধ নেওয়া।

সমাজের আচারে পিষ্ট নারী
দাবি-দাওয়া হয়ে যায় স্তব্ধ,
হৃদয়ের মাঝারে ইচ্ছেরা তবু
জেগে থাকে অপ্রতিরোধ্য।

নারী চায় অধিকার, শিক্ষা
চায় নিজের পায়ে দাঁড়াতে
চায় ভালোবাসা, সম্মান
দৃঢ় সংকল্প আপন সিদ্ধান্তে।

হে নারী! তুমি মা দুর্গা
শিকল ছিন্ন করে এগিয়ে যাও,
করো নিজের স্বপ্ন পূরণ
নিজের অধিকার বুঝে নাও।

আর কালবিলম্ব নয়,
জাগ্রত হও নারী!
নতুন জীবনের জন্য
লড়াই থাকুক জারি।

জীবন

রিয়া সিংহ
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

জীবন!
সেটা আবার কী?
শুধুই কি বাঁচার নাম!
নাকি ভালোভাবে বাঁচার নাম?
নাঃ, সেইসব কিছুই নয়।
হাসিমুখে দুঃখকে গ্রহণ করে
প্রতিনিয়ত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে
যাওয়া,
তারই তো নাম জীবন।

জীবন!
সেটা কি একা শুধু নিজেরই?
নাঃ, তা আবার হয় নাকি!
যাদের জন্য মানুষ বাঁচে,
তাদের জীবন নেই!
জীবন আসলে সকলে মিলে
আলোয়-কালোয়-ভালোর মিশেলে
বেঁচে থাকার নাম।

শীতের কবিতা

বর্ণালী সিংহ
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

চুপিচুপি কোথা থেকে
এলো আজ শীত,
গুন গুন গুঞ্জন
পাখিদের গীত।
কৃষকেরা ধান কেটে
পায় খুঁজে সুখ,
পিঠেপুলি খাবে তাই
উজ্জ্বল মুখ।
রাখালেরা বাঁশি নিয়ে
সুর তুলে গায়,
চারিদিকে মাঠগুলো
ধানে ভরে যায়।

আমাদের কলেজ

অঞ্জলি পাত্র
প্রথম সেমেস্টার
বংলা বিভাগ

কলেজ মোদের ঝাড়গ্রামে
পিচ রাস্তার পাশে,
হাজার খানেক মেয়ে
রোজ সেখানে আসে।
চারিদিকে পাঁচিল দেওয়া
মধ্যিখানে ফুলের গাছ;
পড়াশুনো, হাসি-মজা
নানান প্রকার কাজ।
শিক্ষাগুরুর দেখানো পথে
এগিয়ে যেতে চাই,
বুকে আছে এই ভরসা
মানুষ হবোই ভাই।

রামমোহন

ঋতু মাইতি
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

প্রণাম! প্রণাম! প্রণাম!
লহ গো মোদের প্রণাম!
কালাপানি পেরিয়ে দেখালে দিশা
নবজাগরক রামমোহন।

করিয়াছো রোধ সতীদাহ প্রথা
ওগো প্রণম্য যোদ্ধা!
বাংলার বুকে আসুন ফিরে
হে মহতী সমাজস্রষ্টা!

পরিস্থিতি

সুস্মিতা ঘোষ
প্রাক্তনী, ইরেজী বিভাগ

পরিস্থিতি বড্ড বেসামাল
শান্তি নিরুদ্দেশ,
দিনগুলি সব রংহীন
গতিবিধি নিঃশেষ।
অবসন্ন এ চিত্ত আজি
স্বর তোলে বিবেকের,
প্রতিবাদ হোক অন্যায়ের
আর জোট হোক মানুষের।
এখনো অনেক বাকি
ক্লান্তির নেই অবকাশ
সমাজের গ্লানি মুছে

বন্ধু মানে

প্রিয়াঙ্কা খিলাড়ি
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

বন্ধু মানে!
বন্ধু মানে ঝড়-বাদলের পর
শান্ত একটা আকাশ
বন্ধু মানে মনের মধ্যে
দখিন-খোলা বাতাস।
বন্ধু মানে দুখের সময়
বলবে এসে কাছে
'কাঁদিস কেন মিছে মিছে!
আমরা আছি পাশে।'
বন্ধু মানে 'কী হয়েছে?
সত্যি করে বল।'
বন্ধু মানে 'কিচ্ছু হয়নি,
সব ঠিক আছে, চল।'

শিক্ষার পরিহাস

ঋতু মাইতি
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

শিক্ষার এই শান্ত বনে
জ্বলছে দাবানল,
সেই আগুনে পুড়ছে আজ
তরুণ ছাত্রদল।
কীসের দ্বারা নিভবে আগুন
কেউ কি তা জানে?
হেথায় আজ ব্যস্ত সবাই
ডিগ্রি অর্জনে।
ডিগ্রি নিয়ে কিই বা হবে!
তাও যায় না বলা।
পর্বতসম ডিগ্রি পেয়েও
আজ বেকারত্বের জ্বালা।

শরৎকাল

ঝুম্পা পাল
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা শেষে
এলো শরতের পালা,
আকাশ জুড়ে মেঘেরা এবার
করবে নানান খেলা।
পথের ধারে, নদীর পাড়ে
কাশ ফুলের মেলা,
আনন্দে আজ উঠবে হেসে
সাদা মেঘের ভেলা।
আগামীর রঙিন সুর
ভেসে চলে শরৎ জুড়ে,
দুঃখগুলো হারিয়ে যায়
অজানা কোন খুশির ভিড়ে!

সচেতন হও

মালতী মুর্মু
পঞ্চম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

ওহে মানুষেরা! সচেতন হও,
প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক রও!
দিনে দিনে বাড়ছে মশার কামড় মৃত্যুসমান,
নিমেষেই ঝরিয়ে দিতে পারে নিষ্পাপ জীবন।

ওহে মানুষেরা! সচেতন হও,
প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক রও!
রাস্তায় বেরোলে হতে পারে পথ-দুর্ঘটনা
চলে যাবে প্রাণ, বাড়বে হতাহতের গণনা।

ওহে মানুষেরা! সচেতন হও,
প্রতিটি মুহূর্তে সতর্ক রও!
প্রাণ হাতে নিয়ে চলা, সঙ্গী হয়েছে ভয়;
আজকের পৃথিবীতে কেউ নিরাপদ নয়।

কিছু মেয়ের ভাবনা

ধরিত্রী মুর্মু
দ্বিতীয় সেমেস্টার
দর্শন বিভাগ

কী হবে পড়ে M.A., B.A.,
জন্মেছি যে মেয়ে হয়ে;
একদিন তো বিয়ে করে
যেতেই হবে স্বামীর ঘরে।

যে মেয়েরা এসব ভাবে
তাদের জীবনে উন্নতি হবে!
যাদের কাছে নিরর্থক চাকরি
তাদের জন্য শুধুই শ্বশুরবাড়ি।

এইরকম কেন ভাবিস তোরা!
কোনো কাজেই ছোট নয় মেয়েরা;
বদলে নিলেই নিজেদের ভাবনা
কখনোই আমরা পিছপা হবো না।

বিঁদি-সাধু রামচাঁদ মুর্মু

হেডোরে সুতোম গুদি ওডোঙাম উদবুদি
তেয়ারাম তিঁজাওয়াম
নাটওয়া জালাম।

দারে ডগ ডৌর ফাঁক নাটওয়া সুতাম্ থাক্
আচুরাম চাঁই চাঁই
আডি হাঁই ফাঁই।

গা-গাম গাগাম জাল মনে তাম তাল তাল
সেঁদরা সিঁগাড় বেড়া
আডিম লাঘেড়া।

মাহা জাল বেড় ধারে চকো ওকো কচা করে
তাঁড়াঃ আম থির থার
মাহার ধাচার।

তেজো উরু জুৎ 'র'ক জাল তাম্ রে-ক
লাঠাঃ আক লোট্ পোট্
লহমঃ- জোট্।

তাকিজ ক জাল জেল সেটেরামা অনা হেল
উতুৎ তুপুৎ দাড়
মনেম্ সাবাঁড়।

লাঠা সাল কুটপাট তলে কাটা সাট পাট
জেঁবেৎ জজম সুক
জিউয়িম সেবুক।

অড়েজঃআ জাল যুদি সাটেম সারাও ইদি
সিঞ ঞিঁদা সিঁদি মিঁদি
সেঁদরাম বিঁদি।

বাংলা অনুবাদ –

মাকড়সা

শরীরটা সুতোর গদি   সুতো বোনো নিরবধি
বানিয়ে যে দাও টান
লাটিমের জালখান।

পাতার ডগার ফাঁকে   লাটিমের সুতোর থাকে
হরদম সাঁই সাঁই
ঘুরছো হাঁই ফাঁই।

একগাদা জাল বুনে   চুপচাপ এক মনে
ওৎ পাতো সাঁঝবেলা
শিকারি শিকারে একেলা।

জালের ঝালরে বসে   অপেক্ষা কোণ ঘেঁষে
বসে থাকো চুপচাপ
প্রাণহীন নিষ্পাপ।

পোকা আর মশা মাছি   জালে এসে বসে যদি
জড়াবে ঝটপট
মৃত্যু পটাপট।

জালে জড়ালেই সে   নিয়তি খণ্ডাবে কে
হুটোহুটি শেষবার
কপাকপ সাবাড়।

হুটপাট লুটপাট   বাঁধো পায়ে আঁটসাঁট
শুষে খেতে বড় সুখ
মেটে যে মনের ভুখ।

জাল যদি যায় ছিঁড়ে   চটপট নাও সেরে
রাত দিন প্রতিবার
মাকড়সার শিকার।

অনুবাদে -
পম্পা হেম্ব্রম
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ

ঐরাবতের আগমন

সনাতন মুর্মু

সহকারী অধ্যাপক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ

ঐরাবত, অর্থাৎ হাতি। শহরতলির লোকেরা জঙ্গলের হাতি দেখতে অভ্যস্ত নয়। আবার শহর ছাড়িয়ে যত গ্রাম্য এলাকার দিকে যাওয়া হয় তখন সেখানকার লোকেদের ভেতর দেখা যায় হাতির প্রতি ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা। বলা হয়ে থাকে, হাতি বলতে নেই, বলতে হয় 'হাতিঠাকুর'। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলার প্রায় সব জায়গাতেই পুজোতে ব্যবহৃত উপকরণ হিসেবে হাতি ও ঘোড়ার ছোটমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

দিনটা ছিল ১৫ই আগস্ট ২০২৪। সকালবেলা কলেজে এসেছিলাম পতাকা উত্তোলনের উদ্দেশ্যে। তখনই জানতে পারলাম আমাদের কলেজের পাশের মাঠেই ঘোরাফেরা করছে একদল হাতি। এই দলটা কতজনের তা অনুমান করতে কষ্ট হলো। কারণ কেউ বলে তিনটি কেউ বলে পাঁচটি। তা যাই হোক, জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলায় এ ধরনের ঘটনা হয়ে থাকে মাঝেমধ্যেই। তবে সাধারণত ঝাড়গ্রাম টাউনের ভেতরে দেখা যায় না। কলেজে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে বিভিন্ন সময়ে আসতে হয়, ডিউটি আওয়ার্স বাদ দিয়েও। তা এইরকমই স্বাধীনতা দিবসের দিনও এসেছিলাম। তখন সময় প্রায়সন্ধে ছ টা। এসে স্টাফরুমে আমার যথাযথ স্থানে বসে পড়লাম। আমার বাঁ দিকে কিছু দূরত্বে দরজা। ডানদিকেই এক হাত দূরত্বে জানালা। সামনে খোলা কম্পিউটার যন্ত্র।

স্টাফ রুমের যে জায়গায় বসে আমি কাজ করছিলাম তার ডানদিকে জানালার পেছনে মস্ত আমবাগান এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই দিকে সন্ধ্যে হলে কখনও কোনও রকমের শব্দ পাওয়া যায় না। সেদিন ঘণ্টা খানেক হয়েছে, হঠাৎ দেখি ঐ পাশের জানালা দিয়ে তীব্র আলোর বিচ্ছুরণ ঘটছে। তার সঙ্গে মৃদু কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি জানালা খুললাম এবং যা দেখলাম তাতে শরীরে হঠাৎ করেই রোমাঞ্চ ও ভয় মিশ্রিত একটা আবেগ ফুটে উঠলো। দেখি একটি বিশালকায় বন্য হাতি জানালা থেকে হাত দশেক দূর থেকে ছুটে আসছে এবং ক্রমশ আরও বিশাল আকার ধারণ করছে। পেছনে কলেজের নিরাপত্তাকারক্ষী দাদা প্রতিহার বাবু ডাকছেন 'স্যার কলেজে হাতি ঢুকে গেছে'। জানালা বন্ধ করার অবকাশ পেতে না পেতেই দেখি একি! আরও দুটি শিশু হাতি, বড় হাতিটির পেছন বরাবর ছুটে চলেছে। ততক্ষণে বড় হাতিটি জানালার সোজা থেকে বেঁকে কলেজের ক্যান্টিন অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। ছোট শিশুগুলিও তাকে অনুসরণ করছে। তাদের পেছনে প্রায় ৩০-৪০ জন লোক হাতে লাঠি, বড়

টর্চ, টিনের ডাব্বা আরও কত কিছু নিয়ে হই হই করে ধেয়ে আসছে। জানলা থেকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসি। দেখি কলেজের খেলার মাঠের এক কোণে তিনটি অসহায় বন্য প্রাণী একসঙ্গে জড়োসড়ো অবস্থায় ভীত, সন্ত্রস্ত ও হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা খোলা মাঠ পেয়ে ভেবেছিল হয়তো এবার শহর থেকে বেরোবার রাস্তা পেয়ে গেছে। কিন্তু মাঠের শেষ প্রান্তের প্রাচীর তাদের পথ সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। এদিকে ততক্ষণে কলেজের ছোট মূল দ্বার দিয়ে প্রায় খান পঞ্চাশেক যুবকের দল ঢুকে কৌতুহল ভরা চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

কেউ কেউ উৎসাহে হই হই রই রই করে গোলমাল করছে। এরই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে বিশাল ফোকাস যুক্ত আট দশটি বড় বড় টর্চ লাইট। যার আলোর ছটায় চোখ ক্ষণিকের জন্য আলো আঁধারের ঝাপসানিতে ব্যাকুল হয়ে যায়। সেই প্রাণীগুলিরও হয়তো এই ধরনের কষ্ট যুক্ত অনুভূতি হয়। এরপর হঠাৎই কোনো পথ না পেয়ে বড় হাতিটি আবার কলেজের আমবাগানের দিকে দৌড় লাগায়। সে কি দৌড়! অত বড় প্রাণীটি তিন বা চার সেকেন্ড হয়েছে, খেলার মাঠটি অতিক্রম করে বাগানে ঢুকে পড়ল। পেছনে রয়েছে তার শাবকেরা। তারও পেছনে মানুষ নামের প্রাণীরা কোলাহল করতে করতে ধাওয়া করেছে। এইবার আমার মনে হলো আর আসবে না, চলে গেছে।

কারণ বাগানের পিছন দিয়ে যে পথে প্রাচীর ভেঙে এসছিল সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে গেছে। প্রায় 15 মিনিট পেরিয়ে গেল, আবার হই হই রই রই শুনতে পেলাম। আমিও কলেজ থেকে বেরিয়ে যাব তাই ব্যাগ গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। তখনই প্রতিহার বাবু বললেন 'স্যার এখন বেরোবেন না, মনে হচ্ছে ওরা কাছাকাছি কোথাও অন্ধকারে লুকিয়ে আছে।' আমি ভাবলাম- অভিজ্ঞ লোকের কথা না শুনে বেরিয়ে যাওয়া বিবেচনার কাজ হবে না। স্টাফ রুমে ব্যাগ রেখে দোতলায় উঠলাম। সামনে দোতলার বারান্দায় উঠে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ মচমচ, ঘ্যাটঘ্যাট শব্দ শুনে কলেজের সামনের দিকে তৈরি করা ভেষজ উদ্যানের দিকে নজর পড়লো। দেখি সেই বড় হাতিটি অন্ধকারে চারটি পা স্থির করে দাঁড়িয়ে। যেন মনে হলো শান্ত হয়ে মানুষের আগমনের রাস্তা শব্দ অনুধাবনের মাধ্যমে পরিমাপ করছে! আমি উপরে এবং প্রতিহার বাবু নীচে। উপর থেকে শান্ত গলায় বলছিলাম 'ভেতরে ঢুকে যান একেবারে বাগানের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।' ওনার কোন উত্তর পেলাম না। পর মুহূর্তেই আমার রোমে রোমে শিহরণ জেগে উঠলো। হুলা পার্টি বা হাতি তাড়ানোর দলের লোকেদের ক্রমবর্ধমান শব্দে বড় হাতিটি মুহূর্তে বাগানের লোহার বেড়াটি কাত করে বেরিয়ে এলো একেবারে কলেজের মেন গেটের কাছে। প্রতিহার বাবু গেটটিকে বুদ্ধি করে খোলা রেখে দিয়েছিলেন।

তাই খোলা রাস্তা দেখে হাতিটি সেই দিকে যায়। সঙ্গে একটি শাবক। প্রায় এক থেকে দেড় সেকেন্ড গেটের মুখে এদিক ওদিক তাকাবার পর হঠাৎই আকাশের দিকে সুর তুলে প্রচন্ড জোরে একটা চিৎকার করলো। এটাকেই বলে বৃংহন। মাথার উপর শুঁড় উঠিয়ে, লম্বা সাদা

দাঁত বের করে, ঐরাবতের ব্রিংহন। দৃষ্টি থমকে গেল আমার। পরক্ষণেই দেখি ডাক শুনে আরও একটি শাবক ভেষজ উদ্যান থেকে ছুটে বেরিয়ে আসলো। তখন ই নীচে কলাপসিবল গেট টেনে বন্ধ করার শব্দ পেলাম। কিন্তু যেরকম হাতির ডাকে বুক কেঁপে ওঠে সেই রকমই মানুষের কোলাহল, চিৎকারে মনে হল দুই শাবক সঙ্গে থাকা বড় হাতিটিরও বুক কেঁপে গিয়েছিল। তাই হয়তো গেটের বাইরে না গিয়ে আবার কলেজের ভেতরে তিনটি হাতি পিছনের আম বাগান অভিমুখে অগ্রসর হলো। দোতলায় পিছনের জানলা দিয়ে তাদের দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিছু দেখতে পেলাম না। শুনতে পেলাম শুধু মৃদু বৃষ্টি ভেজা বাতাসের আলোড়ন যা ক্রমাগত দূরে মিলিয়ে গেল। এদিকে আমার মোবাইলে মধুমিতা ম্যাডাম, পম্পা ম্যাডাম, জোহেব স্যার পরপর ফোন করে চলেছেন 'কি হলো' জানার উদ্দেশ্যে এবং আমাকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে। অফিসের হেডক্লার্ক সৈকত বাবু ততক্ষণে ফোন করেছেন থানায় ও বনদপ্তরে। সেই সঙ্গে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও বনপ্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সচিবকেও। উনাদের নাকি বলা হয়েছে আমাদের দুজন অফিসের স্টাফ উদ্ধার করার জন্য ফোর্স পাঠানো হয়েছে। তারপর সাড়ে আটটা নাগাদ প্রতিহার বাবুকে শুভরাত্রি জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। বাড়িতে এসে মনে মনে প্রার্থনা করলাম, আমি যেমন আমার বাড়িতে ফিরে এলাম? সেইরকমই অবলা নিরীহ প্রাণীগুলিও যেন নিরাপদ তাদের বাসস্থানে ফিরে যেতে পারে।

ঘটনাটির দুইদিন পরে শুনতে পেলাম যে বন থেকে আসা হাতির সংখ্যা কেবল তিনটি ছিল না। আরও একটি ছিল। যেটি মানুষের বাসস্থান, শহরে এসে মারা যায়। শুধু তাই নয় এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি মানুষও মারা যায়। তখন মনে মনে ভাবলাম, এই মানুষ আর হাতি ঠাকুরের গল্পটির শেষ অন্যরকম ভাবে সুন্দর হতেও পারতো!

অন্তর্বিবাহে অন্তরায় : সংবিধান ও সমাজের নজরে বিবাহ

ড. সুচন্দ্রা ঘোষ

সহকারী অধ্যাপক

সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

অন্তর্বিবাহ অর্থ দুটি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি হওয়া। ভারতবর্ষে - এই সুপ্রচলিত - অভ্যাসটি স্বাধীনতার পর থেকে আইন হিসেবে প্রণীত (Under the Special Marriage Act)। এক্ষেত্রে প্রচলিত প্রক্রিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায় যে বিবাহের মত একটি ব্যক্তিগত বিষয়ে সংবিধান ব্যক্তি স্বাধীনতা পূর্ণ রূপে সমর্থন করছে বিষয়টি ঠিক সেরকম নয়। বিবাহ প্রক্রিয়া পরিচালনায় বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার ৩০ দিন আগে একটি বিজ্ঞপ্তি অনিবার্যভাবে প্রকাশিত হয়, যাতে যে কোন ব্যক্তি এই বৈবাহিক সম্পর্কে আপত্তি থাকলে জানাতে পারে এবং তার পরিণাম স্বরূপ বিবাহে বাধা সৃষ্টি হয়।

বিবাহে অন্তরায় হওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কখনও প্রত্যক্ষ, আবার কখনও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয়- District Magistrate তাঁর কর্মচারীদের দিয়ে খোঁজ খবর নেন যে বিবাহের জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিরা বিগত ৩০ দিন ধরে একই জায়গায় বসবাস করছেন কিনা ? তাঁর আদেশে কখনও আত্মীয় পরিজনদের জানানো হয় সম্ভাব্য বিবাহ সম্পর্কে। পরিণামে বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পরিবার নিজেই বিবাহে বাধা সৃষ্টি করেছে। অনেক সময় প্রাণনাশের মত ভীষণ ক্ষতিও সাধন করার চেষ্টা করেছে। এরকম অন্তর্বিবাহকে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, পঞ্চায়েতের বিচার ও নিদান, সবই বহু ক্ষেত্রে বাস্তব।

অন্তর্বিবাহ সমাজে নিয়ম বহির্ভূত। এহেন বিবাহের পরে পরিবার পরিজন ও প্রতিবেশীর সাথে পুনরায় সম্পর্ক গঠন করতে কখনও সদ্য-বিবাহিত দম্পতির থেকে আত্মাহুতি হিসেবে তাঁদের প্রাণ নেওয়া হয়। যে সকল ক্ষেত্রে পরিবার পাশে দাড়ায়, সমর্থন করে, অধিকাংশ সময়ে সেই পরিবারকে একঘরে করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পাত্র বা পাত্রীর পরিবার সমাজের চাপে ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তির কাছে ধর্মান্তরিত হওয়ার দাবী রাখে। অন্য ধর্ম গ্রহণের পরই পরিবার, আত্মীয়মহল, প্রতিবেশী ও সমাজে সেই ব্যক্তির মিলন ঘটে। সমাজের রক্তচক্ষুর কোপে পড়লে, প্রশাসন, পুলিশ, কোর্ট কাছারি সুরক্ষা দিতে যে তৎপর, তা নয়। আইন যেমন সুরক্ষা দেয়, তেমন আইনের

ফাঁক দিয়ে অনেক সময় বিপদ এসে দাঁড়ায়। আইন ও আইনি প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান প্রাতিষ্ঠানিক অভ্যেস নিয়ে যারা দীর্ঘদিন গবেষণা করেছেন, তাঁরা অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে পাত্র বা তার পরিবারের বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণ বা অপহরণের মত গুরুতর অভিযোগ আনা হয়। পাত্রীপক্ষ Habeas Corpus'র মত কঠিন ধারায় অভিযোগ দায়ের করে যে তাদের মেয়েকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছে। তবে আইনি অত্যচার দ্বিগুণ হয় যদি সেই সদ্য বিবাহিত পাত্র বা পাত্রীকে হেপাজতে রেখে পুলিশ কোন সদুত্তর না পায়। অর্থাৎ মেয়েটির থেকে অপহরণ বা ধর্ষণ সংক্রান্ত কোন ইতিবাচক জবাব যদি না পায়, তখন পুলিশি হেপাজতেই নবদম্পতিকে শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। এতেও নিস্তার নেই। যদি মেয়েটি সব চোখ রাঙানিতে দমে না যায়, তখন তাকে বাড়ি ছাড়ার আগে সোনাদানা বা অন্য কোন মুল্যবান সামগ্রী চুরি করার অপবাদ দেওয়া হয়। আবার আইনের এমনই কৌশল যে ধর্ষণ বা অপহরণের যা কিছু গুরুতর অভিযোগ তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির ওপর আরোপিত হয়েছে, তা ভুল প্রমাণ করার দায় হাইকোর্ট ও তার। সমাজ, প্রশাসন ও আইনি ক্ষেত্র, সব দিকেই যেন সমস্যা। সমাজে মাথা হেঁট হওয়া, একঘরে হওয়া, ঘরছাড়া হওয়া বা প্রাণনাশের হুমকি, এহেন নানা কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন এই নবদম্পতিকে হতে হয়।

এ প্রসঙ্গে তিনটি ঘটনা / মামলা উল্লেখযোগ্য। Lata Singh Vs State of UP এই মামলায় লতা সিং তাঁর দাদার পরিবারেই থাকত। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর তারা নিজের জাতি বহির্ভূত একজন ব্যক্তিকে আর্য সমাজের এক মন্দিরে বিবাহ করে। তাদের একটি মেয়ের জন্ম হয়। তবে নিজের জাতির বাইরে বিবাহ করার অপরাধে তার দাদা লোকজনকে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে অতিষ্ঠ করে দেয়। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করলে, Lata Singh ও তার পরিবারকে সুরক্ষা দেওয়া হয়। কোর্ট এ মামলা উঠলে আদালত রায় দেয় যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে তার নিজের পছন্দমত বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার আছে। এই ঘটনায় পরিবারের অত্যাচারের থেকে সুরক্ষা, রাষ্ট্রের সমর্থন ও প্রশাসনিক প্রতিরক্ষা সবটুকু মিললেও, Safin Jahan vs Asokan and Ors, কেরালার দুই ভিন্ন ধর্মী ব্যক্তির বিবাহে, হাই কোর্টও বাধা দিয়েছিল। পঁচিশ বছর বয়সি ডাক্তারি পড়ুয়া হাদিয়া যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী Shafin Jahan কে বিবাহ করে, তখন তাঁকে তাঁর পিতার হেপাজতে পাঠিয়ে দেওয়াছিল। তবে দেশের শীর্ষ আদালতে এই case উঠলে, আদালত মামলা খারিজ করে হাদিয়ার বিবাহ কে মান্যতা দেয়।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয় যখন

অন্তর্বিবাহে শ্রেণী সঙ্কট দেখা দেয়। কলকাতার Priyanka Todi Vs Rizwanur Rehman case তারই একটি জ্বলন্ত নজির! তিলজলা বস্তির বাসিন্দা ছিল Rizwanur, একটি Computer Training Centre এ শিক্ষককতা করত। আর সেখানেই এক পড়ুয়া ছিল Priyanka Todi। তাদের আলাপ হয়, সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের বিবাহে বাড়ির সম্মতি না পাওয়ায় তারা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের বিভিন্ন রকম পুলিশি হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল। বিশেষত Rizwanur কে ধনী ক্ষমতাশালী Todi পরিবারের রোষের মুখে প্রাণ দিতে হয়েছিল এবং তার বিচার আজও অধরা।

অন্তর্বিবাহের আলোকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় বিবাহ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সমাজ, প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও বিচারালয়, কোথাও মানুষ সুরক্ষিত নয়।আইনের ভাষা কঠিন এবং মানুষকে সুরক্ষা ও অধিকার দিতে বদ্ধপরিকর হলেও, বিভিন্ন বাধার সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ অসহায় বোধ করে। বলা বাহুল্য যে, আইন যেমন আছে তেমন আছে তার ফাঁক এবং সেই আইনের অসাধু ব্যবহার। অতএব আইন প্রণয়ন সমাজ পরিবর্তনের প্রথম ধাপ হলেও, সমাজে সংগঠনমূলক পরিবর্তন আইনের সঠিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই সম্ভব। এই ইতিবাচক পরিবর্তন কেবল নতুন আইন লাগু করলেই সম্ভব, সেরকম নয়। বরং সমাজে মানসিকতার পরিবর্তন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । সংবিধান যেমন বলে ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা, ব্যক্তির মতামত, তার অধিকারের কথা, তেমন পরিবার, আত্মীয়স্বজন, ও প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধবকেও ব্যক্তির প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। তবেই গোষ্ঠীতে ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সহবাস সম্ভব । সমাজ বিজ্ঞাণের লেখনীতে সমাজ ও ব্যক্তিকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখানো হলেও, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠতে হবে। তবেই প্রকৃত পরিবর্তন সম্ভব।

তাম্রবাহিনী তারাফেনি

সুশীলকুমার বর্মন

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

ফেনায় ফেনায় তারার মণি
তাইতো আমি তারাফেনি।

আমি তারাফেনি। আমি বয়ে চলেছি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে। পৃথিবীতে যখন তোমাদের অর্থাৎ মানুষ নামক প্রাণির আবির্ভাব ঘটেনি তারও আগে থেকে আমি বয়ে চলেছি। ছোটনাগপুর মালভূমির শেষপ্রান্তে, যেখানে রয়েছে ঠাকুরান পাহাড়ের সারি, ঝাড়গ্রামের সেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আমার যাত্রা শুরু। ওখানকার রাজাপাহাড়, রানীপাহাড়, তুলসীচাউরি, দাঁসাকাটা পাহাড়ের বুক থেকে বেরিয়েছে এক সুন্দরী ঝরনা। ভারী মিষ্টি নাম তার। ফুলঝোর। ওই ফুলঝোর থেকেই আমার জন্ম।

জন্মের পর থেকেই আমি আপন বেগে পাগলপারা। গহীন জঙ্গলের মাঝে নিরেট-নিশ্চল পাথরচাটান কেটে এঁকেবেঁকে আমার ছুটে চলা। আদিম যুগে কত বিচিত্র পশু ঘুরে বেড়াত আমার কূলে, কত রং-বেরংয়ের পাখি উড়ে বেড়াত আমার আকাশে, তাদের অনেককেই আর দেখতে পাই না। কোথায় হারিয়ে গেছে ! কত বিশাল বিশাল গাছ ছিল। ছিল কত বাহারি ফুলফল লতাগুল্ম। কোথায় গেল সে সব ! তারপর একদিন এলে তোমরা। মানে আদিমানব। তোমরা থাকতে গুহায়। আমার পাড়ে লালজলপাহাড় গুহা, রাজাপাহাড় গুহা, চাতনডুংরি গুহা, গাড়রাসিনি গুহায়। পাথর ছুড়ে পশুশিকার করতে। পাখি মারতে। উদোম গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমার বুকে। শিকার করতে মাছ। কাঁচা মাছমাংস খেতে। তারপর পাথরে পাথর ঠুকে একদিন আগুন জ্বালাতে শিখলে। মাছমাংস খেতে শিখলে ঝলসে। আরও পরে পোশাক উঠল তোমাদের গায়ে। বাকলের পোশাক, চামড়ার পোশাক। তখন পাহাড় জুড়ে দেখা যেত লাল লাল পাথর। সেই লালপাথর আগুনে গলিয়ে তোমরা বের করলে তামা। তৈরি করলে তামার অস্ত্রশস্ত্র। পাথরের অস্ত্র ছেড়ে তোমাদের হাতে উঠল তামার অস্ত্র। তারও পরে লোহাপাথর গলিয়ে নিষ্কাশন করলে লোহা। তৈরি করলে লোহার অস্ত্রশস্ত্র, কৃষি-যন্ত্রপাতি। কয়েক বছর আগেও আমার দু'পাড়ের গ্রামগুলোতে দেখা যেত তামাপাথর গলানো বা লোহাপাথর গলানোর চুল্লী। আজ আর দেখা যায় না। তামা তৈরি হত বলে আমার পাড়ে একটি গ্রামের নাম তামাজুড়ি। রয়েছে তামলিমাঁইয়ে পাহাড়। তামলিমাঁইয়ে গুহা। গুহার ভেতর রয়েছেন তামলিমাঁইয়ে দেবীমা। খুঁজে দেখ আমার কূলে আজও কোথাও না কোথাও পাবে পাথরের মতো ভারী কালো লৌহমল বা লোহার গাঁদ।

আমি বয়ে চলেছি পশ্চিম থেকে পূর্বে। ঝাড়গ্রামের বরাপাল গ্রাম থেকে নছিপুর পর্যন্ত আশি-পঁচাশি কিলোমিটার দৌড় শেষ করে

আমি মিশেছি কাঁসাই নদীতে। আমার ডান পাড়ে পাবে লালজলপাহাড়, পাটাঘর, তামাজুড়ি, গাড়রাসিনি, খাঁদারানি সরোবর, পিরামিডপাহাড়, চাতনডুংরি, বাঘগুহা, ভালুকগুহা, তুলসীবনী সরোবর, সেরেঞ ডুংরি, বেলপাহাড়ী, শিলদা, ওড়গঁদা, হাড়দা, ঢোলভাঙা, লাঘাটা আর বাম পাড়ে পাবে পতিরাজগুড়া, করাতশোল, উড়লিডাঙা, পাপটপুর, নছিপুর। ডানদিক থেকে এসে আমার বুকে ঝাঁপ দিয়েছে পাটাঘর, জামতলগড়া, যাঁতিহারা, দোমোহানী, কুসুমঘাটিসহ গণ্ডা কয়েক পাহাড়ী ঝোরা। আর বামদিক থেকে এসে আমার সঙ্গে মিশেছে ভৈরববাঁকি।

তোমাদের দেহের শিরা-উপশিরার মতো আমারও দেহে রয়েছে ঝোরা-উপঝোরা। তাই তো আমি হাজার ঝোরার ধারায় ভরা। শিয়ারবিঁদা উচ্চভূমি থেকে বেরিয়েছে জামতলগড়া ঝোরা। ওর কূলে গিদিঘাটি। গিদিঘাটিতে মাঘের চোদ্দ-পনেরোতে মেলা বসে। ঠাকুর ভানসিং মেলা। ভূমিজদের দেহরি-লায়া পুজো করেন ঠাকুর ভান সিং-এর। রাঢ়বাঙলায় অব্রাহ্মণ পুরোহিতদের বলা হয় দেহরি। ঠাকুর ভানসিং মেলার আর এক নাম পিঠাছাঁকার মেলা। কড়া ভর্তি ফুটন্ত ঘি থেকে খালি হাতে কে ক'টা পিঠা তুলতে পারে, মেলায় সেই প্রতিযোগিতা চলে। এমন মেলা, মেলা ভার।

যাঁতিহারা এসেছে বিরগিপাহাড় থেকে। আমডুবিতে ও আমার সঙ্গে মিশেছে। দোমোহানীর সৃষ্টি হয়েছে দুটো ঝোরার মিলনে। একটি খাঁদারানি। সে বয়ে চলেছে গাড়রাসিনি পাহাড়কে বেড় দিয়ে। খাঁদারানির ওপর পাথরের বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে খাঁদারানি সরোবর। গাড়রাসিনির কোলে পাহাড়ঘেরা অপূর্ব সুন্দর হ্রদ খাঁদারানি। শীতকালে এই হ্রদ ভরে ওঠে পরিযায়ী পাখীদের কলকাকলিতে। খাঁদারানির সঙ্গে বারেদহ মিলে নাম নিয়েছে দোমোহানী। কুসুমঘাটি ঝোরা আবার এসেছে আর একটি পাহাড়ী সরোবর তুলসীবনী থেকে। সাজুডুংরি, সেরেঞডুংরির জল এসে পড়ে তুলসীবনী হ্রদে। তুলসীবনীকে গহমবাঁধও বলে। কেন বল তো? এই হ্রদ তৈরির সময় যাঁরা বাঁধ তৈরির কাজে নিযুক্ত ছিল সেই শ্রমিকদের মজুরি হিসেবে টাকা নয় গম দেওয়া হত। স্থানীয় মানুষ গমকে বলে গহম। তার থেকে গহমবাঁধ। তুলসীবনী থেকে বেরিয়ে ডোমগড়, কুসুমডাঙা, বাঁশকাটিয়া, কুলডিহা হয়ে কালাপাথর গ্রামে আমার সঙ্গে মিলেছে কুসুমঘাটি।

আমার বুকে পাথর-ভাস্কর্য ঘাগরাকে দেখে তোমরা নিশ্চয় বিস্মিত হও। তাইতো বারবার ছুটে আস ঘাগরার টানে। পাহাড়ের গা বেয়ে জলের ধারা প্রবল বেগে লাফাতে লাফাতে নেমে এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আমার বুকে। সেই লম্ফমান জলের তোড়ে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিচিত্র সব গর্তের। কোনটা মাথার খুলির মতো, কোনটা চোখের কোটরের মতো, কোনটা আবার কলসি বা ঘাগরার মতো। ঘাগরা প্রপাতের কাছে রয়েছে ঘাগরাসিনি দেবীর থান। মকর সংক্রান্তিতে ঘাগরাসিনির পুজো হয়। ঘাগরার ঘাটে হয় টুসু ভাসান, মকর স্নান। বালুচরে বসে টুসুমেলা।

ঘাগরা দেখে তালসারিপথ বেয়ে তোমরা ছুটে আস তারাফেনি ড্যাম দেখতে। মুগ্ধ হও জঙ্গলের মাঝে গেরুয়া জলের হ্রদ দেখে। এখানে বৈষ্ণবপুর আর হাতিডোবা গ্রামের মাঝে আমার ওপর কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমার কোমরে বেড়ি পরিয়েছ। মানুষের প্রয়োজনে জল ধরে রেখেছ। কী আর করা যাবে ! তোমাদের অসাধ্য কী আছে ?

এগিয়ে চল আমার স্রোত বরাবর নীচের দিকে। বাম তীরে তাকাও। দেখতে পাবে পতিরাজগুড়ার সহদেব মুড়ার কাণ্ডকারখানা। মুণ্ডা সম্প্রদায়ের সহদেব এক অন্য মানুষ। সারাবছর ধরে শেকড়বাকড়-ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা করে। দুর্গাপুজোর দিনগুলোতে চিকিৎসা বন্ধ রেখে মেতে ওঠে দুর্গাপুজোয়। এলেবেলে পুজো নয়, জমজমাট পুজো। সহদেবের দুর্গাপুজোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত ডাকা হয় না। সহদেব নিজেই মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে পুজো করে। এ এক বিরল পুজো। অব্রাহ্মণ পুরোহিতের দুর্গাপুজো। আমারই জল তুলে ঘটে ভরে সহদেব ঘটস্থাপন করে। পুজো শেষে আমার বুকে ঘট বিসর্জন দেয়। সহদেবের দুর্গাপুজো গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে। পারলে একবার দেখে যেও এই বিচিত্র দুর্গাপুজো।

সহদেব দেহরির জন্য প্রতিমা গড়ে দেয় শিলদার প্রতিমাশিল্পী রণজিৎ কালিন্দি। রণজিৎ হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষ। দেখেছি আমার দুকূলের বাসিন্দা হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষরা সুন্দর সুন্দর মাটির প্রতিমা গড়ে। জানিনা এরাই একসময় পাথরের প্রতিমা গড়ত কিনা। কেননা আমার পাড়ে গ্রামে গ্রামে রয়েছে বহু প্রাচীন প্রস্তরমূর্তি।

কত ধর্মের কত কর্মের আমি সাক্ষী ! আমার কূলবাসী আদিবাসী মূলবাসী মানুষজন শুরু করেছিল প্রকৃতির আরাধনা। সূর্য, জল, মাটি, পাথর, পাহাড়, বৃক্ষই তাদের আরাধ্য। আজও তারা প্রকৃতিপূজায় সংলিপ্ত। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে রাঢ়বাঙলায় ভ্রমণ করেছিলেন জৈন ধর্মের চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমার কূলে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসল জৈন বণিকের দল। আদিবাসীদের প্রকৃতিপূজার পাশাপাশি শুরু হল জৈনদের মূর্তিপূজা।

আমার স্রোতে নৌকা বোঝাই তামা, লোহা, রেশম, লাক্ষা প্রভৃতি চালান যেত তাম্রলিপ্ত বন্দরে। তাম্রলিপ্তের তখন ভীষণ রমরমা। বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাম্র রপ্তানিকারী বন্দর তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্তের জন্য আমাদের অঞ্চল থেকে যেত তাম্রবোঝাই নৌকা। তাই আমি তাম্রবাহিনী। আগেই বলেছি আমার কূলবাসী মূলবাসীরা যুগ যুগ ধরে তামা, লোহা নিষ্কাশন করে তার থেকে নিজেদের প্রয়োজন মতো নানান জিনিসপত্র তৈরি করত। তাদের এই তামা-লোহা শিল্পে জোয়ার আনল বহিরাগত জৈন বণিকগোষ্ঠী।

জৈন বণিকগণ নিজেদের ধর্মাচরণের জন্য ঘাটে ঘাটে গড়ে তুলেছিলেন বেশ কয়েকটি দেউল। দেউলের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের আরাধ্য দেবতা তীর্থঙ্করের মূর্তি। দেউলগাত্রের কুলুঙ্গিতে স্থাপন করেছিলেন শাসনদেব-শাসনদেবী বা যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি। জৈনদের সব মূর্তিই পাথরের। সেই সব মূর্তি আজও পাওয়া যায় আমার পাড়ের

গ্রামগুলোতে।

আমার ডান পাড়ে দেখতে পাবে এক অতি আশ্চর্য গ্রাম ওড়গঁদা। গ্রামে রয়েছে পাতালভৈরব থান। এই ভৈরবের মুখমণ্ডল দিয়ে মাঝে মাঝে ধোঁয়া নির্গত হয়। আর কোথাও পাবে এমন অদ্ভুত জায়গা ! পূর্বে এই ভৈরবথানে ছিল বিশাল এক দেবস্থান। সেটি ধ্বংস হয়ে গেছে। পড়ে রয়েছে তার বেশ কিছু চিহ্ন। এখানে ছিল মাকড়াপাথরের সুদৃশ্য দেউল। দেউলের সম্মুখে বিশালাকার নাটমন্দির। দেউল ও নাটমন্দিরের উঁচু চাতাল এখনও রয়েছে। চাতালের ওপর এখনও রয়েছে নকশা করা পাঁচ-ছ'টি স্তম্ভ। ওড়গঁদা গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রস্তর-আমলক। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি বইয়ের লেখক বিনয় ঘোষের মতে এখানে শিবালয় ছিল। আমার মতে এখানে জৈনরা দেউল গড়ে তুলেছিল। সম্ভবত এখানে ঋষভনাথের দেউল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দেউল প্রাঙ্গণে ছিল এক সুদর্শন প্রস্তর-ষণ্ড। ভগবান ঋষভনাথের লাঞ্ছন হল বৃষ। বেলেপাথরে খোদিত সালংকার ষণ্ডটি বর্তমানে পড়ে রয়েছে গ্রামের ভেতর রাস্তার ধারে। জৈনরা স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেউলের ওপর পাতালভৈরবের মূর্তি বসানো হয়। পাতালভৈরবের ভয়ংকর মূর্তি পোড়ামাটির তৈরি এবং ফাঁপা। মূর্তির নাক-মুখ-চোখ দিয়ে সাদা ধোঁয়া নির্গত হওয়ার সময় মাটিতে কম্পন হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, ঐ সময় পাতালভৈরব মিলিত হন ভৈরবী রঙ্কিণীর সঙ্গে, যিনি রয়েছেন ঘাটশিলায়। ভূ-বৈজ্ঞানিক মতে এই দেউল-চাতালের নীচে রয়েছে সুপ্ত গ্যাস-প্রস্রবণ। তার থেকেই মাঝে মাঝে খনিজ ধোঁয়া নির্গত হয়। ওঁড়গদার ভৈরবথানে দুর্গা-একাদশীতে বসে সাঁওতালদের পাটাবিঁদার জমজমাট মেলা।

আমার পাড়ে আরও জৈনকেন্দ্র দেখতে হলে ওড়গঁদা ছাড়িয়ে আমার স্রোত ধরে চলে এসো পূর্বদিকে করাতশোল এবং উড়লিডাঙা গ্রামে। এই দুই গ্রামে রয়েছে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রস্তরপ্রতিমা। পার্শ্বনাথ হলেন জৈনদের তেইশতম তীর্থঙ্কর। করাতশোলের বুক চিরে আমি বয়ে চলেছি। আমার বামপাড়ে রয়েছে গ্রামবাসীর ঘরবাড়ি। ডানপাড়ে ফাঁকা মাঠে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটি সাহাড়া গাছের নীচে রয়েছে গ্রামদেবতা মা বাশুলীর থান। মাকড়াপাথরে খোদিত কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব দিগম্বর তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মূর্তিকেই গ্রামবাসীরা মা বাশুলী জ্ঞানে পুজো করে। পার্শ্বনাথের মস্তকে সপ্তফনা সর্পছত্র। পাদবেদিতে সর্পকুণ্ডলী। তার ওপর প্রষ্ফুটিত পদ্ম। পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন পার্শ্বনাথ। ভগবান পার্শ্বনাথের আর একটি দৃষ্টিনন্দন প্রস্তরমূর্তি রয়েছে আমার বামকূলে উড়লিডাঙা গ্রামে একটি তেঁতুলগাছের তলায়। গ্রামবাসীরা এই মূর্তিকে পুজো করেন ধন্বন্তরী নামে।[১]

এবার আসি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর কথায়। ছোটবেলা থেকে মুখে মুখে সাঁওতালি ভাষায় গান বেঁধে ছেলেটি পাড়ায় ঘুরে ঘুরে গাইত। কী মধুর, কী প্রাণচঞ্চল সে সব গান। তাঁর লেখা একটি জনপ্রিয় গান- দেবন তেঁগোন আদিবাসী বীর দ-... (ওঠো জাগো আদিবাসী বীর গো...)। তাইতো সাধু রামচাঁদ সাঁওতালী

সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথ। ওড়গাঁদা ও শিলদার মাঝে কামারবান্দি গ্রামে ওঁর জন্ম, ওঁর বেড়ে ওঠা। সাধু রামচাঁদ আমার গর্ব।

শিলদাকে আগে বলা হত ঝাটিবনী। ঝাটিবনী ছিল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আদি বাসস্থান সাঁওন্তভূম।[২] এখানে রাজত্ব করতে দেখেছি আদিবাসী সর্দারদের। রাজত্ব করেছেন ডোমরাজারা। ডোমরাজার গড় ছিল বলেই একটি গ্রামের নাম ডোমগড়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে শিলদার জমিদারি লাভ করলেন গোবিন্দ মল্লরায়। তাঁর ছিল সাত রানী। যাঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন রানী কিশোরমণি। রাজা গোবিন্দ মল্লরায়ের মৃত্যুর পর কিশোরমণি রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি পুষ্করিণী খননসহ বহু প্রজাহিতকর কাজ করেছিলেন। আজও রয়েছে শিলদা রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। রয়েছে হাতিশালা, ঘোড়াশালা, দুর্গাদালান। সেগুলি এখন সরকারি দপ্তরের অফিস।

করাতশোল ছাড়িয়ে ছুটে চলেছি কাঁসাইয়ের পানে। কিছুটা পর আমার বামতীর থেকে এসে আমার বুকে ঝাঁপ দিয়েছে ভৈরববাঁকি। তোমরা যাকে ভৈঁরাবাঁকিও বল। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধের উচ্চভূমি থেকে ওর পথ চলা শুরু। ফুলকুসমা, উড়লিডাঙ্গা হয়ে ও পাপটপুরে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ভৈরববাঁকি বোনটি আমার বড়ই দূরন্ত। ভৈরবের মতো ক্ষেপা। বর্ষা হলেই কূলকিনারা ছাপিয়ে দৌড়তে থাকে। একবার ভরা বর্ষায় ওর ওপর নীচু সেতু দিয়ে একটা যাত্রীবোঝাই বাস পারাপার করছিল। হঠাৎ হড়পাবানের তোড়ে পুরো বাসটাই ডুবে গেল। সে করুণ দৃশ্য মনে পড়লে এখনও গায়ে কাঁটা দেয়।

আমার ডান তীরে পড়বে এক প্রাচীন জনপদ হাড়দা। এই গ্রামে রয়েছে অনেক দেবদেবীর মন্দির। গ্রামের শীতলামন্দিরে যে প্রস্তরখণ্ড মাশীতলা জ্ঞানে পূজিত হয়, সেটি আমার জল থেকে পেয়েছিলেন বোগতা সম্প্রদায়ের এক মানুষ। তিনিই পুজো শুরু করেন। আজও ঐ দেহরির বংশধর মাশীতলার পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। হাড়দার উল্টোদিকে আমার বামপাড়ে ডাইবাড়ি গ্রাম। এখানে আমার বকচরে আইখানের পরদিন অর্থাৎ ২ রা মাঘ মেলা বসে। মেলার নাম বিঁদাধরা মেলা। মেলার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ জিলিপি আর তীরন্দাজি প্রতিযোগিতা। তীরন্দাজরা কলাগাছে তীর নিক্ষেপ করে লক্ষভেদ করে।

এরপর আমি মিশে গেছি কাঁসাইয়ের সঙ্গে। মোহানায় আমার বামপাড়ে নছিপুর আর ডানপাড়ে লাঘাটা। একসময় এই ঘাটে লা বা বড় বড় নৌবহর নোগর ফেলত। নছিপুরে ছিল রামগড় রাজার কাছারিবাড়ি। এখানে নদীচরে ৬ ই মাঘ বসে রাজার মেলা। আগে মেলার নামডাক ছিল বহুদূর পর্যন্ত। রাজারা সপরিবারে মেলায় আসতেন। রাজাদের সামনে হত ষাঁড়ের লড়াই, পাঁঠার লড়াই, ভেড়ার লড়াই, মোরগ লড়াই। প্রতিটি লড়াইয়ে বিজয়ী পশু বা পাখির মালিককে রাজামশাই নিজহাতে পুরস্কার তুলে দিতেন। উল্লাসে ফেটে পড়ত জনতা। সে দিন চলে গেছে। সে রাজাও নেই, রাজকাছারিও নেই। ষঁড়ের লড়াই, পাঁঠার লড়াই, ভেড়ার লড়াই আজ ইতিহাস। টিকে আছে কেবল মোরগ লড়াই।

আমার নিজের মতো করে চলা এখানেই শেষ।

এবার তোমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা জানাই। প্রথমেই বলেছিলাম তোমাদের পূর্বপুরুষ আদিমানবের কথা। হয়তো বিশ্বাস করনি। এবার তার পাথুরে প্রমাণ দিচ্ছি। আমি যেখানে কাঁসাইয়ে মিশেছি তার ঠিক মুখোমুখি মানে কাঁসাইয়ের পূর্বপাড়ে রয়েছে সিজুয়া গ্রাম। বছর পঞ্চাশেক আগে ঐতিহাসিক পরেশ দাশগুপ্ত এখানকার নদীচরে খননকার্য চালিয়ে খুঁজে পেয়েছেন প্রায় বারোহাজার বছরের প্রাচীন এক মানুষের (হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স) ভগ্ন চোয়ালের জীবাশ্ম।[৩]

কাঁসাই বা কংসাবতী আমাদের বড়দি। ও আসছে পুরুলিয়ার জাবড়পাহাড় আর মুরগুমা হ্রদ থেকে। আগে কাঁসাই বইত রূপনারায়ণ হয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দর পর্যন্ত। তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে আমাদের নাড়ির টান। সপ্তম দশকে তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতন শুরু হল। জল কমতে লাগল আমাদের বুকে। তামা-লোহা শিল্পে দেখা দিল ভাটার টান। ব্যবসাবাণিজ্যে দেখা দিল মন্দা। জৈন বণিকরা একদিন যেমন এসেছিল তেমনই একদিন কারবার গুটিয়ে চলে গেল। তাদের আরাধ্য দেবদেবীর মূর্তি বিসর্জন দিয়ে গেল আমার জলে। তামা-লোহার শিল্পী-কর্মীরা কিন্তু থেকে গেল নিজ নিজ জায়গায়। আজকের লোহার, কামার, রাণা, ঠাটরি সম্প্রদায় তাদেরই উত্তরসূরি। এদের মধ্যে যারা জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা পরিচিতি পেল শরাক নামে।

জৈনরা যাওয়ার পর নতুন নতুন মানুষ বসতি গড়ে তুলেছে আমার তীরে। তাঁরা জৈন নয়। যেমন করাতশোল গ্রামবাসীরা ভোগতা সম্প্রদায়ের। তারাই আমার জল থেকে পার্শ্বনাথ মূর্তি খুঁজে পেয়ে মা বাশুলী জ্ঞানে পুজো করছে। দেবমূর্তি তো ! তা যে নামেই পুজো হোক মঙ্গল। কিন্তু খুব কষ্ট পাই যখন দেখি অহিংসার পূজারি, বলিপ্রথা বিরোধী, নিরামিশাষী জৈনদের দেবদেবীর মূর্তির সামনে ছাগ বলি, মোরগ বলি দেওয়া হচ্ছে।

সব কথা বলা হল, বাকি যা রয়ে গেল তা পরে শোনো। এবার আমি গান গাইতে গাইতে বইতে থাকি- ..সাগরে মিশিলে নদীর মরণ নাহি হয়, সেই সাগর থিকাই হয়রে বন্ধু ম্যাঘেরই উদয়.....

গ্রন্থসূত্র-

১। রাঢ়বাঙলায় জৈন অবশেষ- সুশীলকুমার বর্মন (সম্পাদনা), আনন্দ প্রকাশন, ২০২২, পৃ-১৬১

২। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি – বিনয় ঘোষ, পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫৭, পৃ-৩৩৭

৩। প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা- পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, অণিমা প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃ- ৫৮

ব্যক্তিঋণ-

-বিধান দেবনাথ, কাঁচালঙ্কা, বেলপাহাড়ি, বিনপুর২, ঝাড়গ্রাম

-কলহন মণ্ডল, শিক্ষক, তুলসীবনী, বেলপাহাড়ি, বিনপুর২, ঝাড়গ্রাম

-সৌমেন মণ্ডল, হাড়দা, বিনপুর২, ঝাড়গ্রাম

-বংশী প্রতিহার, পাপটপুর, বিনপুর২, ঝাড়গ্রাম

-পবন মাহাত, বামুনডিহা, বিনপুর২, ঝাড়গ্রাম

-অর্ধেন্দু মণ্ডল, ভোলাভেদা, বিনপুর২, ঝাড়গ্রাম

-পম্পা হেম্ব্রম, অধ্যাপক, রানী ইন্দিরা দেবী গভর্ণমেন্ট গার্লস কলেজ

এলেম নতুন দেশে...

ড. অমৃতা চক্রবর্তী
সহকারী অধ্যাপক
শারীরবিদ্যা বিভাগ

শারীরবিদ্যার ম্যাডাম আমি। ফার্স্ট সেমেস্টারের ক্লাসে 'শ্বসন' 'সংবহন' পড়াতে হয় নিয়মমাফিক। মাউন্টেন সিকনেস, অ্যাকলিমিটাইজেশন পড়াচ্ছি। সেই প্রসঙ্গে যখন সামনের বেঞ্চগুলোয় বসে থাকা মুখগুলোকে পাহাড়ি পাকদন্ডী বেয়ে হাঁটার সময় হাঁপিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা জিজ্ঞেস করছি, বুঝতে পারছি ছোট্ট ছোট্ট মুখগুলোয় ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা আর বোবা অন্ধকার ছাড়া কিছু নেই। এদিকে আমি আদতে বেড়ানো-পাগল মানুষ। পৃথিবীর সমস্ত বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে কোনো না কোনোভাবে আমার মুখে বেড়ানোর গল্প চলে আসে, নদী রচনা লিখতে গিয়ে গরু রচনা লিখে চলে আসার মতো। বুঝেছিলাম, ফেসবুকের এই রঙিন দুনিয়া যতই ষ্টারমার্কা হোটেলের বৈভব আর বন্দে-ভারতের গৌরব নিয়ে একের পর এক ট্যুর গ্রুপ খুলে ফেলুক না কেন, আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা দূরপাল্লার ট্রেনে স্লিপার ক্লাসে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতাটুকু ছাড়াই একটা গোটা জীবন অতিক্রান্ত করে ফেলেছেন। তাঁদের জীবনে বেড়ানোটা একটা বিলাসিতা। আসলে বাংলা সিনেমা যতই আমাদের ডালভাত আর বিরিয়ানির উদাহরণ দিয়ে বিলাসিতা আর প্রয়োজনের ফারাক বোঝাতে চাক না কেন, আমরা তো জানি বিলাসিতা আর প্রয়োজনের সংজ্ঞা অর্থনৈতিক অবস্থান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। আমার কাছে হয়তো কলকাতার বুকে একটা চার-কামরার ফ্ল্যাট, একটা অডি গাড়ি কিংবা বিদেশী প্রসাধনীটা বিলাসিতা, কিন্তু আমার থেকে ওপরের অর্থনৈতিক স্ট্র্যাটায় থাকা মানুষজনের কাছে এটা আর বিলাসিতা নয়, নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন। উল্টোদিকে আমার কাছে বেড়ানোটা যেমন প্রয়োজন বলে মনে হয়, আমাদের ভারতবর্ষের অগণন মানুষের কাছে সেটা বিলাসিতা। স্বচ্ছল জীবনের অভ্যেস একটু একটু করে বিলাসিতাকেই একদিন আমাদের প্রয়োজন বানিয়ে দেয় , আমরা টের-ও পাইনা।

এই মুহূর্তে যে ভ্রমণকাহিনীটা আমি লিখতে চলেছি, আমাদের কলেজের মেয়েরা সেটা আদৌ কোনোদিন পড়ে দেখবে কিনা আমি জানি না, যেমন জানি না এ লেখা পড়েও তারা কোনোদিন আগামী জীবনে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ তৈরী করে নিতে পারবে কিনা। তবু, ওদের কথা ভেবেই আমার সাম্প্রতিক কালের এই বাজেট ট্রিপটার গল্প লিখে রেখে গেলাম ...

যদিও ছোট বেড়ানোতে আমার চিরকালই মুখ ভেটকে থাকে, তবু এবার বাড়ির বড়দের বয়সজনিত অসুস্থতা আর ছোটদের

ব্যস্ততাজনিত অনিশ্চয়তা আমাদের খানিক বাধ্য করলো পুজোর ছুটিতে চার রাত-পাঁচ দিনের রাঁচি-নেতারহাট ভ্রমণে। রাঁচি-নেতারহাট একেবারেই দূরদেশ নয়, বলা ভালো পাশের রাজ্য ঝাড়খন্ডেই এর অবস্থান। যাওয়ার জন্য ট্রেন অনেকই আছে, তবে আমার মতে সবথেকে ভালো ট্রেন ক্রিয়া-যোগা এক্সপ্রেস। রাত ন'টা দশে হাওড়া থেকে ছেড়ে ভোর পাঁচটা কুড়িতে রাঁচি স্টেশন। ভারতবর্ষের ট্রেন একটু আধটু লেট্ তো করবেই, সেটা ধরে নিলেও সকাল ছ'টার মধ্যে নামিয়ে দেবে ঠিকই। ট্রেনটার সবথেকে বড় সুবিধে যে এটা ঝাড়গ্রাম হয়েই যায়। ফলে, যে কেউ চাইলে ঝাড়গ্রাম থেকেও এই ট্রেনটায় উঠতে পারে। টু বা থ্রি টায়ার এসি কম্পার্টমেন্ট তো আছেই, যেহেতু রাতের জার্নি চাইলে স্লিপার ক্লাসেও টিকিট বুক করা যায়, পকেটের ওপর ততটা চাপ পড়বে না তাহলে।

কিভাবে যাওয়া যাবে তো বলে দিলাম, এবার বলি কখন যেতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, কখন বেড়াতে যাচ্ছি, তার ওপর নির্ভর করে একটা জায়গা কতটা সুন্দর লাগবে বা লাগবে না। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বৃষ্টি-কুয়াশা মাখা কার্শিয়াঙের আবেদন যে কোনোদিন ভারতবর্ষের অন্য যে কোনো নামী-দামী শৈলশহরকে বলে বলে দশ গোল দেবে। রাঁচি-নেতারহাট মূলতঃ জলপ্রপাতে ঘেরা মালভূমি অঞ্চল, বর্ষার পর যখন নদীনালাগুলো বৃষ্টির জলে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, তখন জলপ্রপাতের সৌন্দর্য্য আলাদাই। অনির্বচনীয়...

রাঁচি যাওয়ার সবথেকে ভালো সময় তাই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। বেড়াতে গেলে সবথেকে আগে লাগবে গাড়ি আর বাড়ির হাল-হদিশ। কিসে যাওয়া যায়, কোথায় থাকা যায়... লাটেহার ট্যুরিজমের ওয়েবসাইট থেকে গাড়ি আর হোটেল বুক করে নেওয়া যায় পছন্দমাফিক। গভর্নমেন্ট আন্ডারটেকিং সংস্থা, রেট ফিক্সড। ঠকার সম্ভাবনা কম। এছাড়া ঝাড়খণ্ড ট্যুরিজমের হোটেল রাঁচিতে বিরসা-বিহার আর নেতারহাটে প্রভাত বিহার এই দুটোর অনলাইন বুকিং হয় , লাটেহার ট্যুরিজম থেকে হবে না। রাঁচিতে স্টেশনের কাছে হোটেলে থাকাই শ্রেয় আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলবো, নেতারহাটে হোটেল রবি-শশীতে আরামে থেকেছি।

এবার সোজাসুজি চলে যাই বেড়ানোর বর্ণনায়। আমরা রাঁচিতে নেমে স্টেশন চত্বরেই সকালের চা-টুকু খেয়ে নিলাম। গাড়ি এসে গিয়েছিলো সময়মাফিক। গাড়িতে উঠে রওনা দিলাম নেতারহাটের উদ্দেশ্যে। পথে একটু জলখাবারের বিরতি। ঝাড়খণ্ডে পৌঁছেও কচুরি-জিলিপির খোঁজ। আর সে জিলিপি যে কী মুচমুচে আর কী সুস্বাদু, এখনো মুখে লেগে আছে। এরপর রাস্তায় পড়লো পালামৌ-এর জঙ্গল আর কোয়েল নদী। মসৃন পিচ রাস্তার দুপাশে ঘন সবুজ পালামৌ আর সেই সবুজের বুক চিরে তিরতির করে বয়ে চলেছে কোয়েল নদী। খানিক দাঁড়াতেই হয় 'কোয়েলের কাছে'। এরপর আবার এগিয়ে চলা। নেতারহাট পৌঁছে গেলাম দুপুরের আগেই। হোটেলে ঢুকে স্নান করে মধ্যাহ্নভোজন। বাঙালি যেখানেই যায় মাছভাতের খোঁজ করে, আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। যদিও মাছ খেয়ে

মন ভরলো না তেমন, কিন্তু ভাতঘুমে কমতি হল না। বিকেলের দিকে চলে গেলাম নেতারহাট সানসেট পয়েন্ট। যদিও সূয্যিমামা মেঘের আড়ালেই মুখ লুকিয়ে ছিলেন, কিন্তু শেষ বিকেলের সেই কমলা রঙের মায়া জঙ্গলের ক্যানভাসে ছড়িয়ে পড়ে এক অপরূপ নিসর্গ রচনা করে ফেললো, আমরা মুগ্ধ দর্শকের ভূমিকায়। সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ফিরে চিকেন পকোড়া সহযোগে কফি। সাথে চলছে সান্ধ্য আড্ডা। হঠাৎই ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই খেয়াল করলাম, দু-হাত সামনের জিনিস-ও আর দেখা যাচ্ছে না। গোটা এলাকাটা ঘন মেঘের আস্তরণে ঢেকে গেছে। আলোর সামনে দাঁড়ালে মেঘের ভেসে ভেসে চলে যাওয়াও স্পষ্ট প্রতীয়মান। এর আগে মেঘালয় গেছি, সিকিম গেছি, উত্তরবঙ্গ গেছি, গায়ের পাশ দিয়ে মেঘ ভেসে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার নতুন নয়। নেতারহাট তো সেই অর্থে সুউচ্চ পাহাড়ি অঞ্চল নয়, কিন্তু এই মাঝারি উচ্চতার আদিম জনপদেও যে মেঘ নেমে এসে আপাত সাধারণ সন্ধ্যের বুকে এমন রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলতে পারে, আগে টের পাইনি কখনো। রাতের মেনু ছিমছাম একদম, চিকেনের ঝোল আর রুটি। রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে আমরা কয়েকজন একটু হাঁটতে বেরোলাম হোটেলের বাইরের রাস্তা ধরে। নিকষ-কালো অন্ধকার, জনমানবশূন্য লোকালয়; বিশেষ কিছু দেখার নেই; ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কিছু শোনাও যাচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃতির এই অপার নৈঃশব্দ যে আদতে কতটা বাঙ্ময় হতে পারে, টের পেয়েছিলাম ওই রাতে।

নেতারহাটে দ্বিতীয় দিন, পরিকল্পনা অনুযায়ী আজ নেতারহাটের সবকটা দেখার জায়গা ঘোরার কথা আমাদের। তবে, ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই গেলাম সানরাইজ পয়েন্টে। আগে যে প্রভাত বিহার হোটেলটার কথা বলেছিলাম, তার একদম কাছেই সানরাইজ পয়েন্ট। অনেকেই হোটেলে বসে সূর্যোদয় দেখবেন বলে এই হোটেলটা বুক করেন, তবে আমাদের হোটেলটা থেকেও দিব্যি হেঁটে আসা যায় এখানে, অসুবিধে হয় না। বিধি বাম এখানেও, মেঘলা ছিল বলে সূর্যোদয় দেখা গেলো না তেমন। তবে ভোরের মিঠে রোদ্দুর আর মনোরম আবহাওয়াই বলে দিচ্ছিলো কেন নেতারহাটকে 'ছোটনাগপুরের রানী'র অভিধা দেয়া হয়েছে। হোটেলে ফিরে স্নান আর জলখাবারের পালা সমাধা করে বেরিয়ে পড়লাম কোয়েল ভিউ পয়েন্টের উদ্দেশ্যে। অনেক দূর থেকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে কোয়েলকে দেখা, মন্দ লাগেনি। কিন্তু তার থেকেও বেশি চিত্তাকর্ষক কোয়েল ভিউ পয়েন্টে পৌঁছনোর রাস্তাটুকু। দুপাশে ঘন পাইন বন, মাঝখান দিয়ে এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে রাস্তা, ছবির মত সুন্দর। এরপর আমাদের গন্তব্য ঘাঘরী জলপ্রপাত। আপার ঘাঘরী আর লোয়ার ঘাঘরী , জলপ্রপাতের দুটো ভাগ। জলপ্রপাতে নামার রাস্তটুকু সহজসাধ্য নয়, বয়স্ক মানুষ এবং শিশুদের জন্য তো বেশ অসুবিধেজনক। কিন্তু জলপ্রপাত অবধি পৌঁছোতে পারলে, মন ভালো করা দৃশ্য একেবারে। চুপ করে শুনি জলের শব্দ। আলো-ছায়া মাখা অরণ্যপথে স্রোতস্বিনীর অবিশ্রান্ত কলকলানি গোটা পরিবেশটাকেই কী ভীষণ রোম্যান্টিক করে তুলেছে! ঘাঘরী

ছাড়িয়ে এবার আমরা পৌঁছে গেলাম লোধ ফলস, বুরহা নদীর ওপরে ১৫০ মিটার উচ্চতার জলপ্রপাত। নেতারহাট তো বটেই, ছোটনাগপুর অঞ্চলের অন্যতম সুন্দর জলপ্রপাত। আমরা যখন পৌঁছলাম, তখন আকাশে মেঘের ঘনঘটা, অল্প অল্প বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে। এদিকে খিদেও পেয়ে গেছে বেশ। লোধ ফলসের রাস্তাতেই দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে। পছন্দ করে কিনে পাশের দোকানে অর্ডার দিয়ে দিলেই সুন্দর ঝাল-ঝাল মুরগির ঝোল রান্না করে দেবে। দেখে শুনে মুরগি পছন্দ করা হলো, দরদাম চললো। সে-ও এক নতুন অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যে এক প্লেট ধোঁয়াওঠা গরম গরম ম্যাগি খেয়ে পা বাড়িয়েছি লোধ ফলসের রাস্তায়। অনেকগুলো সিঁড়ি উঠে তবে তার দেখা মেলে। পায়ের ব্যথা থাকলে ভারী মুশকিল শেষ অবধি পৌঁছোনো। আমরাও একটু-আধটু শারীরিক কষ্ট সহ্য করেই এগোচ্ছিলাম, মাঝরাস্তায় তুমুল বৃষ্টি। ছাতাতেও শেষরক্ষা হচ্ছে না। তবু সেই বাদলদিনে জলপ্রপাতের যে অনির্বচনীয় রূপ দেখেছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। সুউচ্চ জলপ্রপাত ধাপে ধাপে নেমে গেছে পাহাড়ের কোল বেয়ে। মেঘলা আকাশ, উথালপাথাল হাওয়া, ঝিরঝির বৃষ্টি আর পাথরের ওপর প্রবল গতিতে আছড়ে পড়া জলরাশি... সময় থমকে যায়! লোধ ফলস ঘুরে এসে আমরা গরম গরম ভাত আর দেশি চিকেন সহযোগে পেট আর মন দুইই শান্ত করলাম। এর পর আমরা চললাম শ্যালেট হাউসের দিকে। যদিও বৃষ্টি থামার নাম নেই, তবু সেই ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই সেই সুন্দর কাঠের বাড়িতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এলাম আমরা। বাড়ির চারপাশটাও যেমন প্রকৃতি ঢেলে সাজিয়েছে, তেমন বাড়ির অন্দরের গৃহসজ্জাতেও রুচির ছাপ স্পষ্ট। নেতারহাট রেসিডেন্সিয়াল স্কুলটাও শুনেছি, দেখার মতো। কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে স্কুলক্যাম্পাসে ঢুকে দেখার মত পরিস্থিতি আমরা পেলাম, এগিয়ে গেলাম ম্যাগনোলিয়া সানসেট পয়েন্টের দিকে। মেঘলাদিনে সূর্যাস্তের শোভা দেখা গেলো না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাহাড়ের কোলে এমন অলস-মেদুর বিকেল কাটানোর সৌভাগ্য সচরাচর আমাদের মেলে না, তাই পরিতৃপ্তির অভাব হল না। সারাদিনে বিস্তর ঘোরাঘুরি হয়েছে, আর কোথাও নামার পালা নেই। গাড়িতে উঠে ঘন পাইন বনের রাস্তা ধরে এবার সোজা হোটেলে ফেরা। সান্ধ্য আহার, নৈশভোজ হোটেলেই। খানিক আড্ডা মেরে, ছবি দেখে, মজা করে বিছানায় গেলাম। জম্পেশ ঘুম চাই একটা, পরের দিন সকালে গন্তব্য রাঁচি। অনেক অবশ্য এখন থেকে বেতলা-ও যান, কিন্তু আমরা সবদিক থেকেই ছোট ট্যুর করতে চেয়েছিলাম। তাই আর বেশি জায়গা দেখার প্ল্যান রাখিনি।

নেতারহাট থেকে রাঁচি আসতে সেদিন গোটা একটা বেলা লাগলো। রাস্তার সৌন্দর্য্য এত নয়নাভিরাম, যে বারবার মনে হয়, ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ তবু একসময় পথ শেষ হয়, হোটেলে ঢুকি। হোটেলে নেমে স্নান সেরে দুপুরের খাওয়াদাওয়া। আবার একটা অলস দুপুর কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা পায়ে হেঁটেই রাঁচি শহরটা একটু ঘুরে নেওয়া। আলো ঝলমলে, জমজমাট শহর রাঁচি। কিন্তু বড্ড ট্র্যাফিক।

প্রচুর দোকানপাট, মানুষজন, নিরিবিলি নয় সেই অর্থে। শহুরে হট্টগোলের মধ্যেই খানিক সময় কাটলো আমাদের। পরের দিন যাবো রাজরাপ্পা।

সকাল থেকেই প্রস্তুতি তুঙ্গে। রাঁচি থেকে রাজরাপ্পা প্রায় ৭০ কিলোমিটারের পথ। রাস্তায় পড়লো হুড্রু জলপ্রপাত। নামী পর্যটন কেন্দ্র। দোকান পসরায় জমজমাট। পুজোর ছুটিতে বেশ ভিড়। সুবর্ণরেখার ওপর হুড্রু জলপ্রপাত ঝাড়খণ্ডের উচ্চতম জলপ্রপাত। আর কে না জানে, যত বেশি উচ্চতা, তত বেশি সিঁড়ি। সাতশোর বেশি সিঁড়ির হুড্রু জলপ্রপাত নেমে তো পড়লাম হুড়মুড়িয়ে। বর্ষার পর এখন সব জলপ্রপাতই সজীব। অনন্ত ধারারাশি খাড়া পাহাড় থেকে লাফিয়ে নামছে। 'তনু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা! ঝর্ণা' দেখার পালা শেষ করে সিঁড়ি উঠতে গিয়ে টের পেলাম শারীরি ফিটনেস কত কম আমাদের! যাইহোক, তবু ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ওপরে উঠে আরো একটা অপূর্ব জায়গা দেখলাম। হুড্রুর সিঁড়ি যেখান দিয়ে নামছে, তার ঠিক বাঁ দিক দিয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরে নেমে পড়লে জলপ্রপাতের ওপরের অংশে পৌঁছোনো যায়। ছোট ছোট টিলা আর ঢেউখেলানো মালভূমির ওপর দিয়ে সুবর্ণরেখা বইছে আপন ছন্দে। ভারী চমৎকার লাগে দেখতে। হুড্রুকে বিদায় জানিয়ে এবার আমরা চলে যাবো রাজরাপ্পার দিকে। ভৈরবী নদী আর দামোদর নদের সঙ্গমে মন্দির হয়েছে অনুচ্চ পাহাড়ি টিলায় রাজরাপ্পায়। একান্ন পীঠের এক পীঠ। দেবী এখানে দশমহাবিদ্যার অন্যতম ছিন্নমস্তা মহামায়ারূপে বিরাজিত। দেবীর আশিসে ভক্তের মনোস্কামনা পূর্ণ হয় এমনই জনশ্রুতি। চারপাশের প্রকৃতিও সুন্দর রাজরাপ্পার। আগে ভৈরবী নদীর জল পেরিয়ে মন্দিরে যেতে হতো, শুনেছি। আমাদের অবশ্য সেসব কিছু করতে হয়নি, কিন্তু মন্দিরে পুজো দিয়ে স্রেফ আনন্দ পাওয়ার জন্যই আমরা খানিক জলে পা ভেজালাম। মন্দিরের চারপাশে অনেক দোকান, পুজোর সামগ্রী তো বটেই, সৌখিন জিনিসপত্র আর খাবারের দোকান। সেখানেই এক জায়গায় নিরামিষ মধ্যাহ্নভোজ সেরে আমরা এগিয়ে চললাম পত্রাতু ভ্যালির দিকে। শহরের কোলাহল ছেড়ে খানিক দূর এগোলেই দুপাশে অঢেল সবুজ আর ছোট ছোট টিলার সমারোহ। অনুচ্চ পাহাড়ের কোলে কালো পিচঢালা বিসর্পিল রেশম পথ, খানিকটা সিকিমের সিল্ক রুটের সঙ্গে তুলনীয়। ভ্যালি যাওয়ার আগেই পড়বে লেক। পাহাড়ে ঘেরা পত্রাতু জলাধার। সূর্যাস্তের সময় নৌকোবিহার করতে মন্দ লাগে না। গোটা এলাকাটাই বেশ সুন্দর করে সাজানো। আর অসংখ্য খাবারের দোকান। এখানে একটু ফুচকা না খেয়ে যাওয়া যায়! পত্রাতু ভ্যালির ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালে অনেক দূর পর্যন্ত ঘন সবুজ প্রান্তর আর এঁকেবেঁকে যাওয়া পথের হদিশ মেলে। আর এটুকু দেখার জন্যই বছর বছর পর্যটকরা ভিড় জমান পত্রাতু ভ্যালিতে। চাইলে এখান থেকে টেগোর হিলস, রক গার্ডেন আর পালানি ফলস দেখে নেওয়া যায়। আমরা অবশ্য আর এগোইনি। সন্ধ্যে নেমে আসছিলো, এবার আমাদের রাঁচির হোটেলে ফেরার পালা। রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে। পরের দিন আমরা যাবো জোনা, দশম আর সীতা ফলস।

জলখাবার খেয়েই বেরিয়েছি আমরা। আজ

প্রথম গন্তব্য দশম ফলস। কাঞ্চি নদীর ওপরে তৈরী হওয়া এই জলপ্রপাত যেন 'পাষানের স্নেহধারা'! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই জলপ্রপাত স্থানীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসের একটি অংশ। জলপ্রপাতের কাছাকাছি বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায় যেমন মুন্ডা, ওরাওঁ, হো এবং সাঁওতাল উপজাতিরা এটিকে একটি পবিত্র স্থান বলে মনে করে। দিগন্তবিস্তৃত বারিধারা আর চারিপাশে গহীন সবুজের লাস্য-বিভঙ্গ যেন দশমকে আরও বেশি মোহময় করে তুলেছে। দশম পেরিয়ে এবার যাবো জোনহা। মোটামুটি পাঁচশো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। সিঁড়ি নামার আগে নিখাদ বাঙালির স্বভাববশতঃ দেশি মুরগি আর ভাতের অর্ডারটা দিয়ে দিলাম। জোনহাও তার ব্যাপ্তি আর লাবণ্যে আমাদের বিস্মিত-রোমাঞ্চিত হওয়ার সুযোগ দিলো আর একবার। সিঁড়ি বেয়ে নামার রাস্তায় বিভিন্ন ধাপে ভিউ পয়েন্ট করা আছে। চারিদিকে ক্যামেরার ঝলকানি; সকলেই যে যার মত ছবি তুলতে ব্যস্ত। অশান্ত জলরাশি বৃষ্টির ছাঁটের মতোই ভিজিয়ে দিচ্ছে আমাদের। দেখে দেখে আশ মেটে না যেন... আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব-অভিযোগ, ক্লেদ-ক্লান্তি, দৈন্য-গ্লানির এই বুঝি একমাত্র নিরাময়... 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা!' দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে আমাদের এই ট্যুরের শেষ গন্তব্য সীতা ফলস। সারাদিন অনেক আলো-ঝলমলে রূপসীদের সান্নিধ্য পাওয়ার পর বাড়ির শান্ত, আটপৌরে মেয়েটির দিকে তাকলে যেমন মন ভালো হয়ে যায়, সীতা ফলস দেখার পর আমাদের উপলব্ধি খানিকটা তেমনই। বাড়তি কোনো মাদকতা নেই, কিন্তু তার নির্মেদ শরীর জুড়ে এমন এক নির্ভেজাল আভিজাত্য আছে, যার আবেদন অস্বীকার করা মুশকিল। ঢালাও সবুজ, সোঁদা মাটির ঘ্রান, জলতরঙ্গের মূর্ছনা আর মখমলের মতো মসৃন যাত্রাপথকে সঙ্গী করে এবার আমাদের ফেরার পালা। ব্যাগপত্তর গুছিয়ে নিই। রাতের খাবার প্যাক করি। ফেরার ট্রেনও একই, ক্রিয়া যোগা এক্সপ্রেস। রাত দশটায় রাঁচি ছেড়ে সকাল সাতটায় হাওড়া পৌঁছোনো।

এবারের বেড়ানো এখানেই শেষ। ছোট্ট অথচ নিটোল পরিপাটি। কম সময়, কম অর্থব্যয়ে নিশ্চিন্তে কেটে গেলো ক'দিন। মুগ্ধতা আর প্রশান্তিতে পেরিয়ে এলাম এক স্বপ্নিল ল্যান্ডস্কেপ। ফিরতি পথে মন খারাপের সুর, আবছায়া জানলার কাঁচ ...

প্রথম কলেজ যাওয়ার অভিজ্ঞতা

ময়না নায়েক
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ইতিহাস বিভাগ

আমার নাম ময়না নায়েক। আমি 'রাণী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজের ছাত্রী। আমি ২০২৩সালে 'আঁধারিয়া রাজ বল্লভ হাই স্কুল'– থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে আমি যখন প্রথম এই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন এই কলেজের নাম ছিল–'ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ (মহিলা শাখা)। পরবর্তী কালে ২০২৪ সালে কিছু কারণ বশত এই কলেজের নাম পরিবর্তন করে 'রাণী ইন্দিরা দেবী গভর্নমেন্ট গার্লস কলেজ' রাখা হয়।

প্রথম যেদিন স্কুলের গণ্ডি পেরিরে কলেজে গিয়েছিলাম সেদিন মনের মধ্যে যেমন প্রচুর উত্তেজনা ছিল, তেমনি একটু ভয়ও ছিল। মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল। এতদিন স্কুলে আমরা অন্য নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে ছিলাম। এখন কলেজে যাব, নতুন নিয়ম হবে। নতুন জায়গা, নতুন বইপত্র, নতুন অধ্যাপক অধ্যাপিকা হবে। এই সব ভাবনা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

প্রথম যেদিন কলেজে যাই 'ভেরিফিকেশন –এর জন্য, সেদিন কিছু কারণ বশত আমার অভিভাবক আমার সাথে যেতে পারেননি। আমি কয়েক জন বান্ধবীর সাথে সেদিন কলেজে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কেউই কলেজে পৌঁছোবার রাস্তা সঠিকভাবে জানতাম না। তাই বাস থেকে নেমে রাস্তায় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে প্রথম দিন কলেজে পৌঁছেছিলাম। কলেজে পৌঁছোবার পর একজন দিদি আমাকে আমার ক্লাস রুমে পৌঁছে দিয়ে ছিল। সেদিন নতুন ক্লাসরুম, নতুন অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের সাথে পরিচয় হয়েছিল। সবকিছু জানলাম চিনলাম। তারপর থেকে নিয়মিত ক্লাস শুরু হয়ে যায়। স্কুলে যেমন শিক্ষক, শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও ভালোবাসা পেয়েছি, কলেজেও ঠিক তেমনি অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের কাছ থেকে সহযোগিতা ও ভালোবাসা পাই। এখন সেই অচেনা কলেজ আজ আমার সবচেয়ে চেনা জায়গা। কলেজের প্রথম দিনে যদিও সঠিকভাবে সবকিছু বুঝে উঠতে বা চিনে উঠতে পারিনি, কিন্তু এই প্রথম দিনটি আমার কাছে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

‘পিয়াল’ তোমায় দিলাম খোলা চিঠি

সুস্মিতা ঘোষ
প্রাক্তনী
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ইংরেজী বিভাগ

দেখতে দেখতে পার করলে তুমি আরো একটি বছর। তৃতীয় বর্ষের পূর্তিতে নব তারুণ্যে সাজে তোমার আঙিনা। নব নামাঙ্কিত হল তোমার ঠিকানা। তবে তুমি আজও আগেকার মতোই আছো আশা করি। আচ্ছা! তোমার মনে পড়ে বিগত বছরগুলোর কথা? কত পাখির নীড় সময়ের প্রবাহে বহমান স্রোতের ন্যায় চলে গিয়েছে অন্যত্র। তাদের সবার হয়ে খোলা চিঠি উড়িয়ে দিলাম আজ। শুনবে তুমি, শুনবো আমি আর শুনবে এ আকাশ। কালক্রমে কেউ বা পেয়েছে নতুন ঠাঁই, কেউ বা পাড়ি দিয়েছে অন্যত্র, কেউ বা হয়েছে যাযাবর, কেউ বা বন্দি খাঁচার ভিতর কেউ বা রয়েছে ছড়িয়ে কাছে দূরে, কেউ হয়তো প্রত্যহ নীরবে আসার প্রত্যাশা রাখে, কেউ বা হাসিল করেছে খানিক সুখ, কেউ বা নিরন্তর অভ্যাসরত, কেউ বা চাতকের ন্যায় আকাশ পানে চেয়ে আজও স্মৃতিচারণ করে অবিরত। চাইবে যেদিন পিছন পানে, বুঝবে সেদিন সর্বসুখ লুকিয়ে অনন্তের মাঝারে। স্মৃতিচারণ আনে চোখের কোনায় জল ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি। আসুক বিপত্তি বাধা বিপর্যয়, তবু যেন না টলে তোমার আশ্রয়। স্মৃতিটুকু অম্লান থাক।

তৃতীয় বর্ষের পূর্তি উপলক্ষ্যে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আবারো বলি, ভালো থেকো পিয়াল।

অবলম্বন

স্বাগতা মল্লিক
দ্বিতীয় সেমেস্টার
ইংরেজী বিভাগ

শীতের শেষ, সবেমাত্র বসন্তের আগমন ঘটেছে। সকাল সকাল ফোন পেলো অনুর্ভবা। যে অফিসে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়ে এসেছিলো সেখানে ওর চাকরিটা হয়ে গেছে।

অনুর্ভবা হলো পিতা মাতাহীন এক সন্তান। ওর বয়স যখন চৌদ্দ, তখন একটি দুর্ঘটনায় পরিবারের সকল মানুষকে ও হারিয়ে ফেলে, ওদের গ্রামে ওর কাছের বলতে ছিল কেবলই ওর ডাক্তার জেঠু নিজের বলতে তাঁরও কেউই ছিলনা বিবাহও তিনি করেননি বাবা–মা চলে যাওয়ার পর ডাক্তার জেঠুই ছিল অনুর্ভবার একমাত্র অবলম্বন আত্মীয় স্বজন কেউই সেই অসহায় মেয়েটিকে গ্রহণ করতে রাজি ছিল না, এরপর ওর জেঠু ওকে নিয়ে কলকাতায় চলে যান। কলকাতার একটি ভালো স্কুলে পড়াশুনো করান। এইভাবে তিনি অনুর্ভবাকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন।

কয়েকদিন আগে একটা বড়ো অফিসে অনু ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল আজ সকালেই তারা ওকে জানালো যে ওর চাকরিটা হয়ে গেছে। আগামী সোমবার থেকেই সেখানে যেতে হবে সময়সীমা আর বাকিসব নির্দেশাবলী অফিসে গেলে দেওয়া হবে। বিকেলে অনু আর জেঠু একসাথে উঠোনে বসে গল্প করছে। ওদের বাড়ির উঠোনের ঠিক কাছেই একটা বিশাল শিমূল গাছ ছিল গাছটি নিজের শাখাপ্রশাখা দিয়ে সমস্ত বাড়িটাকে কেমন যেন আগলে রাখত, প্রায়শই অনু আর জেঠু একসাথে ওই শিমূল গাছের নীচে বসে গল্প করত। সেইদিনও একইরকমভাবে তারা একসাথে বসে আছে। অনু অফিসে এতই ভালো একটা চাকরি পেয়েছে শুনে ভারী আনন্দ পেলেন জেঠু। চোখের কোন দুটি ছলছল করে উঠল।

পরিবারকে হারানোর পর জেঠুই ছিল অনুর যাবতীয় আশা ভরসা। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও মানুষ কাউকে এতটা আপন ভাবতে পারে, এটা ওর জেঠুকে না দেখলে মনে হয় বিশ্বাস হবে না। সেদিন বিকেলে জেঠু কীসব আবোল তাবোল বলছিলেন –এর আগে এভাবে কখনো বলেননি। নিজের জীবনে জেঠু কি কি করতে চেয়েছিলেন আর কি কি করতে পারেন নি, সেসব নিয়েই আক্ষেপ প্রকাশ করছিলেন অনুর কাছে। এমনকি, একাকীত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি নিজের জীবন কিভাবে অতিবাহিত করেছেন, সেসবও বললেন। অনুকে তিনি পরামর্শ দিলেন যাতে সে কোনোদিনই কোনো পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়ে, সারাজীবন যাতে হাসিমুখে সে জীবনের সকল কঠিন সত্যকে মেনে নেয়।

এরপর প্রতিদিনের মতোই রাত্রে যে যার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল। তার পরেরদিন সকাল হয়েছিল কিন্তু সেই সকালের মধ্যে যেন আভাস উজ্জ্বলতার কোনো ছিলনা। সকালে জেঠুর ঘরে উষ্ণ চা নিয়ে গিয়ে জানতে পারল সব কিছুই শেষ আর কোনো আশাই নেই। বিছানার মধ্যে পড়ে রয়েছে জেঠুর প্রাণহীন দেহ। তিনি আর অনুকে ডাকছেন না, আর কথা বলছেন না ওর সাথে। হাসপাতালে ভর্তি করে অনু জানতে

পারল কালরাত্রে জেঠুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। জেঠুর পাশের ঘরেই তো ঘুমচ্ছিল অনু তাও সে একটা বারের জন্যেও কিছু বোঝেনি এই তো কাল বিকেলেই কত গল্প করছিল, আর রাত্রেই সব শেষ! কিছু টেরও পেলো না। সে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর জেঠু ঘুমোতে গেলেন। কেউ কী জানতো, সে ঘুম আর ভাঙবেনা! এই সমস্ত ভেবে ভেবে অনু নিজের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকল। হাটে বাজারে তেমন যাতায়াত নেই, বাইরের কারুর সাথে কথা নেই। এখন সে সত্যিই একা, কেউ নেই তার। সে নিজেকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ করে নিয়েছে।

এক বিকেলে অনু উঠোনে বসে আছে, কিন্তু একা–পাশে নেই ওর ডাক্তার জেঠু। দূরের ওই শিমূল গাছটির দিকে অনু একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। গাছটি থেকে একটি শুকনো পাতা ঝরে পড়ল।

এইভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে গেলো এরপর অনু চারদেওয়ালের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করলো। নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে সে, কিন্তু আগেকার সেই চঞ্চল মেয়েটি ওর মধ্যে থেকে যেন হারিয়ে গেছে, কোনো এক দুর্গম স্রোত যেন অনুর সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে।

অনু ওর আগের অফিসে আবার আবেদনপত্র পাঠাল। একটু ভোগান্তি হলো বটে, কিন্তু শেষমেষ চাকরিটা সে পেলো। অফিস বাজার হাট এভাবেই সময় কেটে যেত তার। এতো বড়ো পৃথিবীতে ওর নিজের কেউই ছিল না। আস্তে আস্তে অফিসে বেশ কয়েকজন ভালো বন্ধু পেল অনু–ওই বন্ধুদের মধ্যে অনুর সবচেয়ে কাছের একজন ছিল। অনু তাকে নীল বলে ডাকত মানুষটি ছিল বেশ হাস্যরসিক, বিশেষতঃ সারাদিনের কাজের শেষে যে সামান্য হাসি ফুঁটে উঠত অনুর শান্ত স্নিগ্ধ মুখটিতে, তার কারণ হিসেবে কেবল সেই একজন মানুষই ছিল। সেই সমস্ত কিছু যা অনু হারিয়ে ফেলেছিল, সবই নীলের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছিলেন সে অনু। আর এইভাবেই বন্ধুত্বের সম্পর্কটা ওদের অজান্তেই অনেকটা এগিয়ে যায়। নিজেদের বাকি জীবনটা একসাথে কাটানোর জন্যে ওরা প্রস্তুত হয়ে পড়ে। নীল জানিয়েছিল তার কোনো আপনজন ছিলনা, ছিলনা কোনো পরিবার। সেহেতু বিবাহের অনুমতি নেওয়ার মতো, বিবাহের আয়োজন করার মতো কোনো আপনজন ছিল না। তাদের অফিসের সামান্য কিছু বন্ধু–বান্ধবকে নিয়েই শ্রাবণের এক শুভ দিনে অনু আর নীল বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হল। দিনটা সত্যিই ছিল খুব শুভ, খুবই সুন্দর। জেঠুকে হারানোর পর প্রথমবার অনু অত্যন্ত খুশি ছিল। আর হবে নাই বা কেন? নীলাঞ্জনের মতো একজন মানুষকে যে জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। অনুর মনে হয়েছিল জীবনে যা কিছু আক্ষেপ যা কিছু অপূর্ণতা ছিল, সব এবার মিটে যাবে।

এরপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে তাদের ছোট্ট সংসার। দুজনেই একে অপরের সাথে বেশ ভালোই ছিল। একটা ছোট্ট বাড়িতে খুব সুন্দরভাবে নিজের মতো করে অনু সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছিল। সব স্বাধীনতাই নীল দিয়েছিল অনুকে, তবে বিবাহের পরে অনুর অফিস যাওয়ার ব্যাপারটাতে সে মোটেই রাজি ছিলনা। অনু চায়নি নীলের কথা অমান্য করতে । তাও সে কয়েকবার বুঝিয়েছিল তাকে ... কিন্তু রাজি করাতে পারেনি। নিজে কিছু করার ইচ্ছেটা অনুর প্রথম থেকেই ছিল। অনু কখনোই চায়নি কারোর ওপর নির্ভর করে চলতে, কাউকে অবলম্বন করে চলতে কিন্তু সে পারেনি নীলকে

বোঝাতে। তাই সে যাতে অভিমান না করে, সেইজন্যে নিজের সমস্ত ইচ্ছে বিসর্জন দিয়ে দেয় অনু। প্রথম প্রথম ভারী কষ্ট পেয়েছিল আস্তে আস্তে সে সমস্ত কিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। বিভিন্ন কারণে নীল ভীষণ রাগ করত, কারণটা সামান্যই হোক কিংবা বৃহৎ কিছু। অনু প্রতিবার শান্ত মনে সবকিছুই খুব সুন্দরভাবে সামলে নিত। এভাবেই বৈবাহিক জীবনের একটা বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। সংসারী জীবনে সামান্য মতভেদ হলেও তারা একসাথে বেশ সুখী ছিল।

এরপরই এল সেই বিশেষ দিনটি। অনেক বছর আগে সেই দিনটাতে অনু প্রথম জগতের আলো দেখেছিল। আগে সারাটা বছর ও যতই কষ্ট পাক না কেন, এই বিশেষ দিনটি ওর জীবনে সর্বদাই ভালোভাবে কেটেছে। এইবার তো আরোই বেশি সুন্দর হওয়ার কথা, কারণ তার পাশে তো এখন নীল রয়েছে। নীলাঞ্জনকে ছাড়া অনু কোনো কিছুই ভাবতে পারতো না। কিন্তু অনুর ইদানীং মনে হয়, অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে নীলাঞ্জনের। অনু যাকে চিনত, সেই মানুষটা ক্রমশই হারিয়ে যাচ্ছে, ক্রমশই বদলে যাচ্ছে। আগে অনুর হাসির একমাত্র কারণ হিসেবে যে মানুষটি ছিল, এখন হয়ত অজান্তে সেই মানুষটাই অনেকটা কষ্ট দিয়ে ফেলে অনুকে সে যাই হোক না কেন, অনু কেবলই নীলের প্রতি আসক্ত ছিল।

জন্মদিনের আগের রাতে অনু ভেবেছিল নীল হয়ত ওকে শুভেচ্ছা জানাবে। কিন্তু সারাদিনের ক্লান্তির পর নীল রাত্রে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। না, অভিমান হয়নি অনুর, কিন্তু শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছিল। কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল সে নীল ঘুমোচ্ছিল তাই ওকে আর কিছু জানানো হয়ে ওঠেনি। রাত্রে অনু ঘুমোতে পারেনি ঠিক মতো।

পরেরদিন ছিল অফিসে ছুটি ছুটির দিন, তাই নীলকে আর সকাল সকাল উঠতে হয়নি। অনুও তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে চায়নি। তাই ওকে না জানিয়েই সে বাজারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার জন্যে । আবারও সেই একই অস্বস্তি অনুভব করে অনু আর জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কাছেরই একটা হাসপাতালে ওই রাস্তার কিছু লোকজন ওকে নিয়ে যায়। অনুর যখন জ্ঞান ফেরে, তখন সে হাসপাতালে। ডাক্তার দেখিয়ে অনু এরপর বাড়ি ফিরে আসে। নীল ততক্ষণে উঠে পড়েছে। অনু তার জন্য চা নিয়ে যায়। আর ঠিক তখনই দেখে বিছানার ওপর রয়েছে খুবই সুন্দর গোলাপের পাপড়ির মতো কোমল একটি লাল শাড়ি। শাড়িটা ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। সে ভারী আনন্দ পেয়েছিল এটা ভেবে যে নীল ওর জন্মদিন ভোলেনি। ওর জন্য এত সুন্দর একটা শাড়ি কিনে এনেছে নীল। খুশিতে চঞ্চল হয়ে ওঠে অনু। সকাল সকাল স্নান সেরে নীলের আনা শাড়িটা সে পরেনেয় আর খোলা কালো চুলে সিঁথি কেটে রক্তিম সিঁন্দুরে রাঙিয়ে দেয়। রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠেছিল। নীল রজনীগন্ধা ভালোবাসে বলে অনু নিজে বাজার থেকে ফুলগুলো কিনে নিয়ে এসেছিলো।

বাজার থেকে ফিরেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু এখনও নীলের সাথে সেভাবে কথা হয়নি অনুর আসলে যখন থেকে সে এসেছে, নীল কারো একজনের সাথে ফোনে কথা বলছিল। হয়ত দরকারি কিছু, তাই সে আর কিছু বলেনি নীলকে। কিন্তু নীলকে যে অনেককিছু বলার আছে, আজকের সারা দিনটা সে নীলের সাথে কাটাবে। সুযোগ পেলে কাছাকাছি কোথাও একটা ঘুরে এলেও বেশ হয় । একা একা এই

সমস্ত ভেবে ভেবে অনু এক কল্পনার মধ্যে ভেসে গেল। দূর পাহাড় অতিক্রম করে একটি ছোট্ট দেশ যেখানে না আছে কোনো ঝগড়া, না আছে কোনো মান অভিমান। আছে কেবলই অনুর্ভবা আর নীলাঞ্জন, কেবলই নীল আর অনু চারিদিক ভরে উঠেছে রজনী ফুলের গন্ধে। হঠাৎ কীসের যেন শব্দ! অনু কল্পনার জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে জানালার দিকে চেয়ে দেখল বাইরে ভীষণ ঝড় উঠেছে । ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। জানালাগুলি সে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়, কিন্তু নীল কোথায়? অনেকটা সময় তো পেরোলো, কোথায় সে? অনু সারা বাড়ি খুঁজলো, তবুও তাকে পেলোনা। তাকে খুঁজতে খুঁজতে অনু ছাদে গিয়ে পৌঁছালো। ওখানে নিয়ে যা দেখল, খানিকটা অবাকই হল তাতে। ছাদের এক কোণে নীল দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও ফোনে কথা বলছে সে। অনু সামান্য কিছুটা এগিয়ে গেল, তারপর ভাবল না থাক জরুরী কিছু হবে হয়ত। এই ভেবে সে যখন পিছন ফিরল, অপরিচিত নারীর এক পরিচিত কন্ঠস্বর তার কানে ভেসে এল। ''মেয়ের কথা বুঝি তোমার আর মনে পড়ে না?'' তার ছোটো বোন। হ্যাঁ, এটা তো অনুর বোনেরই কন্ঠস্বর। ওদের সমস্ত কথাই শুনলো অনু। আত্মী-স্বজনের সাথে অনুর কোনো যোগাযোগ ছিল না বটে কিন্তু বেশকয়েক বছর আগে গ্রামের শ্যামলকাকা ব্যবসার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন তাঁর কাছে অনু শুনেছিল তার পিসতুতো বোনের। বড় ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে। যার সাথে বিয়ে হয়েছে সে নাকি কলকাতায় অনেক বড়ো অফিসে চাকরি করে। নীলাঞ্জন রায়, রায় বাড়ির একমাত্র ছেলে নীলাঞ্জন রায়। বাইরের আকাশের কালো মেঘ ভীষণ জোরে গর্জন করে উঠল। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সদ্য কিনে আনা ফুলগুলো যেন ফ্যাকাশে হয়ে পড়ল। শুভ্রবর্ণের সৌন্দর্য্য যেন ত্যাগ করল। সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে গেল। অনু বেরিয়ে পড়লো রাস্তায়। সেখানে ছিল ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রবিদ্যুৎসহ ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল কাজল কালো আঁখি ভরা চোখের জল আর পরনে লাল শাড়ি অনুর সঙ্গী। অনেক কথা ছিল নীলকে বলার– হল না বলা–

সেখানে ছিলনা তার নীল, ছিলনা কেউ। সে আবারও একা। ফিরে গেল ওর ডাক্তার জেঠুর বাড়িতে ফিরলো নিজের চাকরিতে। দেখতে দেখতে বেশ অনেকগুলি দিন পার হয়ে গেল।

অন্ধকার এক রাত্রি, দূরের আকাশে বাঁকা চাঁদ উঠেছে, সারা আকাশ ঝিলমিল তারায় ছেয়ে রয়েছে। উঠোনে বসে আছে অনুর্ভবা একা। চোখ দুটি তার ছলছল। চারিদিকে ঘুটঘুটে কালো আঁধারে কেবল শিমূল গাছটিই। চাঁদের আলোয় ভরে উঠেছে। গাছটির দিকে চেয়ে অনু দেখল, পরিচিত পুরানো সেই গাছটির সমস্ত পাতা ঝরে গেছে। কিন্তু অনেকটা উঁচুতে – তাকালে মনে হবে ডালগুলি চাঁদকে স্পর্শ করে রয়েছে। রূপালী চন্দ্রমার সৌন্দর্য্যে বিলীন হয়ে গেছে। সেখানে কেবল অস্তিত্ব রয়েছে একটিমাত্র পাতার।

এই পাতাটাই হয়ত অনুর মধ্যে বেড়ে ওঠা সেই নিষ্পাপ ক্ষুদ্র প্রাণটি! হয়তো বা...

The Bittersweet Bond

Rachana Dey
Semester-I
Department of English

On their first day of college, Aisha and Raya, literally ran into each other. Apologies turned into introductions, and their connection was instant.

Aisha, a shy literature enthusiast, found solace in Raya's bold and adventurous spirit. Raya, a Psychology Major, admired Aisha's creative genius. Together, they explored the campus, attending poetry readings and concerts, and late night conversations about life and often engaged in staying awake for dreams. Their bond deepened, and they became inseparable. Professors and peers admired their friendship.

However, fate had other plans.

Raya was diagnosed with a terminal illness during their final year. Aisha stood by her side, supporting her through every hospital visit, and chemotherapy session. As Raya's health declined, Aisha's determination to make every moment count grew intense.

On the day of graduation Raya attended the graduation cermony. Aisha brought the ceremony to Raya's hospital bed, wearing her own cap and gown. With tears streaming down their faces, the shared a heartfelt goodbye. Raya passed away a week later, leaving Aisha shattered.

The Cost of Greed

Diya Rajak

Semester -I
Department of English

Once upon a time, there were two men, Rakesh and Karan. Rakesh was extremely poor, unable to afford food or clothes. He had only one dress which was his daily wear and lived on the streets, begging near the temple to fill his stomach. On the other hand, Karan was an extremely wealthy individual without any shortages. He lived a luxurious life with ample food, clothes and wealth. Despite having a beautiful family, he couldn't spare time for them. His life's sole aim was to earn money. He was so consumed by wealth that he, neglected his family and everything else.

Rakesh lived a peaceful life, content with whatever little he had. He used the charity he received to sustain himself, finding solace in simple meals. He slept, ate without worries, feeling genuinely happy and fulfilled with what he had. Meanwhile, Karan was relentlessly pursuing wealth, neglecting his family's pleas for attention. His wife and children begged for time, but he couldn't spare it. This caused him immense sorrow, yet his ambition drove him forward. One day, Karan saw Rakesh begging and was struck by his contentment despite poverty. Karan thought, he is happy with so little, while I'm stressed despite having much more. Then Karan felt perplexed and tense, wondering. How can I despite being wealthy, not find happiness? Why doesn't wealth bring me joy, while this beggar is content with so little? Is wealth not the ultimate goal? Have I misunderstood life's true values?

Karan thought he would test Rakesh's happiness by leaving a bag full of money near him that night. Will it bring him joy tomorrow? Karan executed his plan, leaving the bag of money near Rakesh. In the morning, Rakesh found a bag beside him and when he looked inside, he saw a lot of money and he was surprised and overjoyed. He lost his appetite and sleep, haunted by the fear of theft. His peaceful life was ruined by the fear and sudden wealth. Rakesh's life completely changed since the bag of money came into his life. Earlier, his life was totally peaceful and smooth, but after receiving the money, his life became miserable. There was no longer any peace in his life, only tension and stress. Everything that was happening to Rakesh, Karan was watching from a hidden place, seeing everything that was unfolding. This made Rakesh realize that earning too much isn't good either. He should balance his earnings with them, spending quality time, going on outings and doing all these things together.

Earning money is important, but only until it doesnot become an obsession that consumes us and drives us away from our family.

Finally, Karan understood this truth.

Moral of the story :- Wealth should not come at the cost of losing loved ones and compromising relationships. Balance is key to a fulfilling life.

Humanities in Twenty First Century

Ananya Mahata

Ex-Student
Department of English

“Nothing is so painful to the human mind as a great and sudden change” -*Mary Shelley, Frankenstein.*

Ascending in Time's chariot, the 21st century is witnessing a colossal change, an outcome of the global shift towards innovation and technological development. The effect of this change on education is that the international focus has shifted towards the STEM subjects-Science, Technology, Engineering and Mathematics. Many of the people think that the overwhelming emphasis on STEM education has pushed the subjects of Arts and Humanities off to the curbside in the classroom. But Humanities will never go away as long as we have human beings, because-

“The greatness of humanity is not in being human, but in being humane” - Mahatma Gandhi.

In this technology-focused world, the lessons of Humanities are needed not only in our classrooms but also in our life to keep balance between the changing world and human psyche. On one hand, the subjects of Humanities help to expand our intellect, teach us to communicate seamlessly, and help us to develop critical thinking skills. On the other hand, they create autonomous thinkers, reinforce cultural and ethical responsibilities and values, and also help us to understand the impact that science, technology, and medicine have had on society. By analysing how people have tried to make moral, spiritual and intellectual sense of the world, it teaches empathy and understanding. The Stanford University Humanities Center describes Humanities as-

“The study of how people process and document the human experience.”

In this era of STEM subjects, the most common question is 'Will Humanities survive in 21st century?' The answer to this question is the survival of Humanities will depend on the adaptation and society's recognition of the contribution of these subjects towards a balanced, thoughtful, and humane world. By learning to weigh evidence skeptically and consider more than one side of every question, Students of Humanities of build skills that are useful in all aspects of life and business. The best Arts and Humanities schools are located everywhere across the globe. Stanford University,

Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, University of Oxford, University of Cambridge are also the top universities for pursuing Humanities.

To make this world not merely a concrete 'house' but a better 'home', we need to observe the subjects of Humanities critically and document the present with maximum objectivity. By studying Philosophy, Literature, Art, Music, Sociology and Language we begin to see the interconnectedness of all areas of knowledge and how the Humanities and STEM subjects all fit together and complement with each other. So, in this twenty first century, Humanities are not just an aesthetic luxury to be served as a side dish in the halls of higher education, but an essential part of our education system. Beyond the classroom, it is a lifelong learning process where the human thoughts and souls are expanded to be nourished and refreshed. This age reflects the image that the STEM subjects and Humanities are the buds of a single stalk and the blooming of these buds simultaneously makes the earth a tranquil "home".

সাবিত্রী পট্টনায়ক
প্রথম সেমেস্টার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

সাবিত্রী পট্টনায়ক

প্রথম সেমেস্টার

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

প্রিয়া দাস
দ্বিতীয় সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ

রুমা আঢ্য

প্রাক্তনী
সংস্কৃত বিভাগ

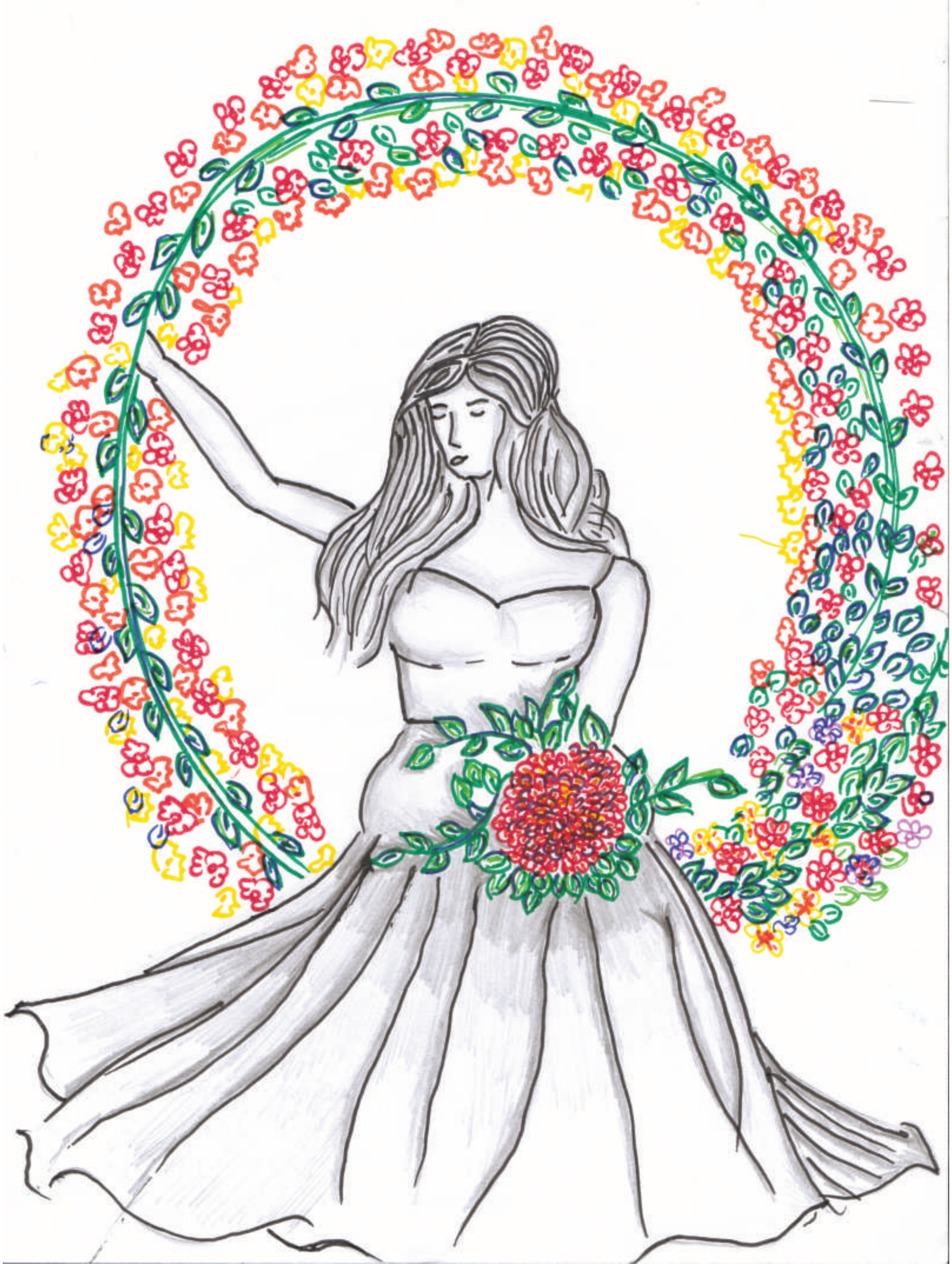

শ্রুতি সরকার

প্রথম সেমেস্টার

দর্শন বিভাগ

দেবস্মিতা ঘোষ

দ্বিতীয় সেমেস্টার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

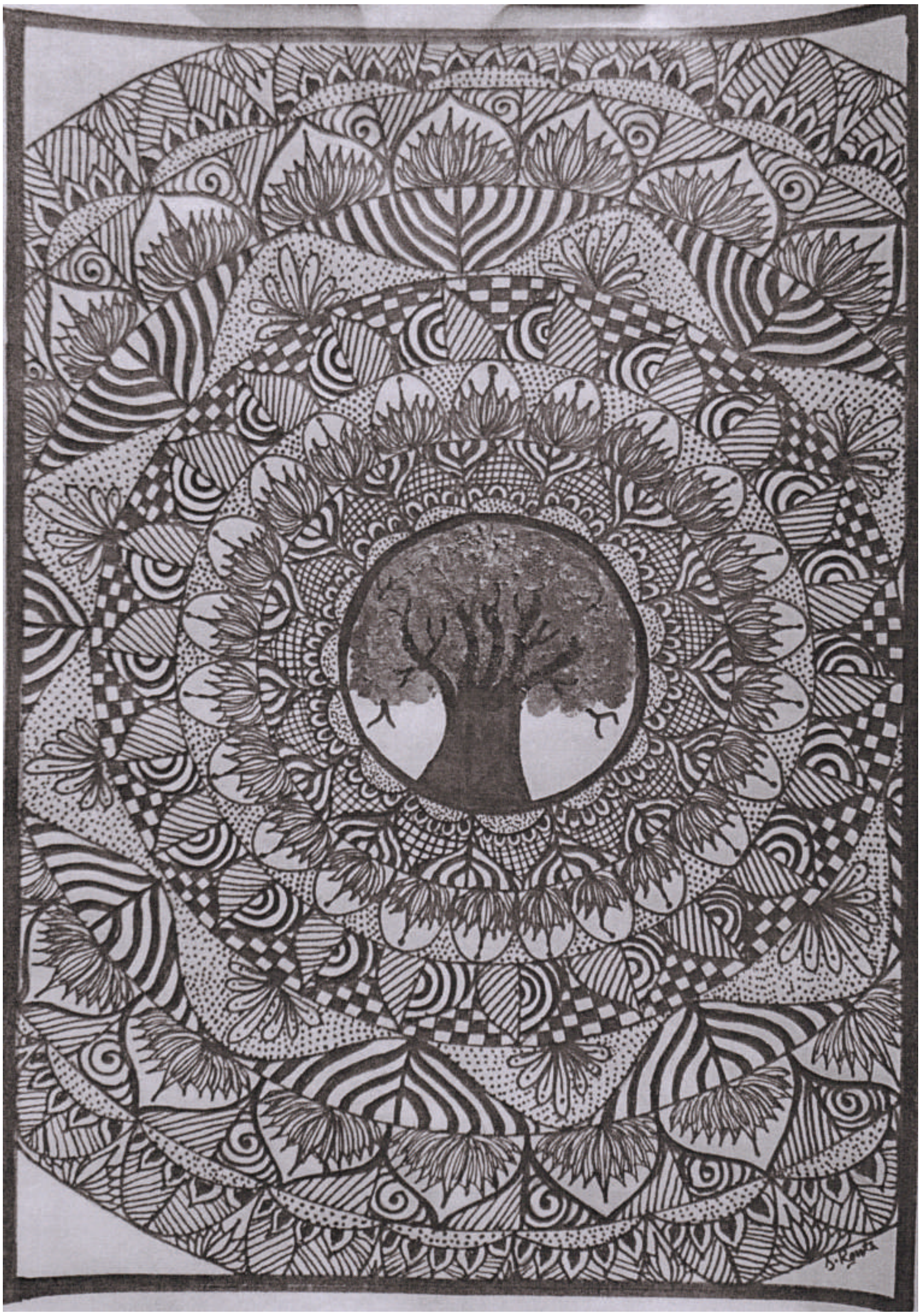

শ্রেয়া রাউত

প্রাক্তনী
ইংরেজী বিভাগ

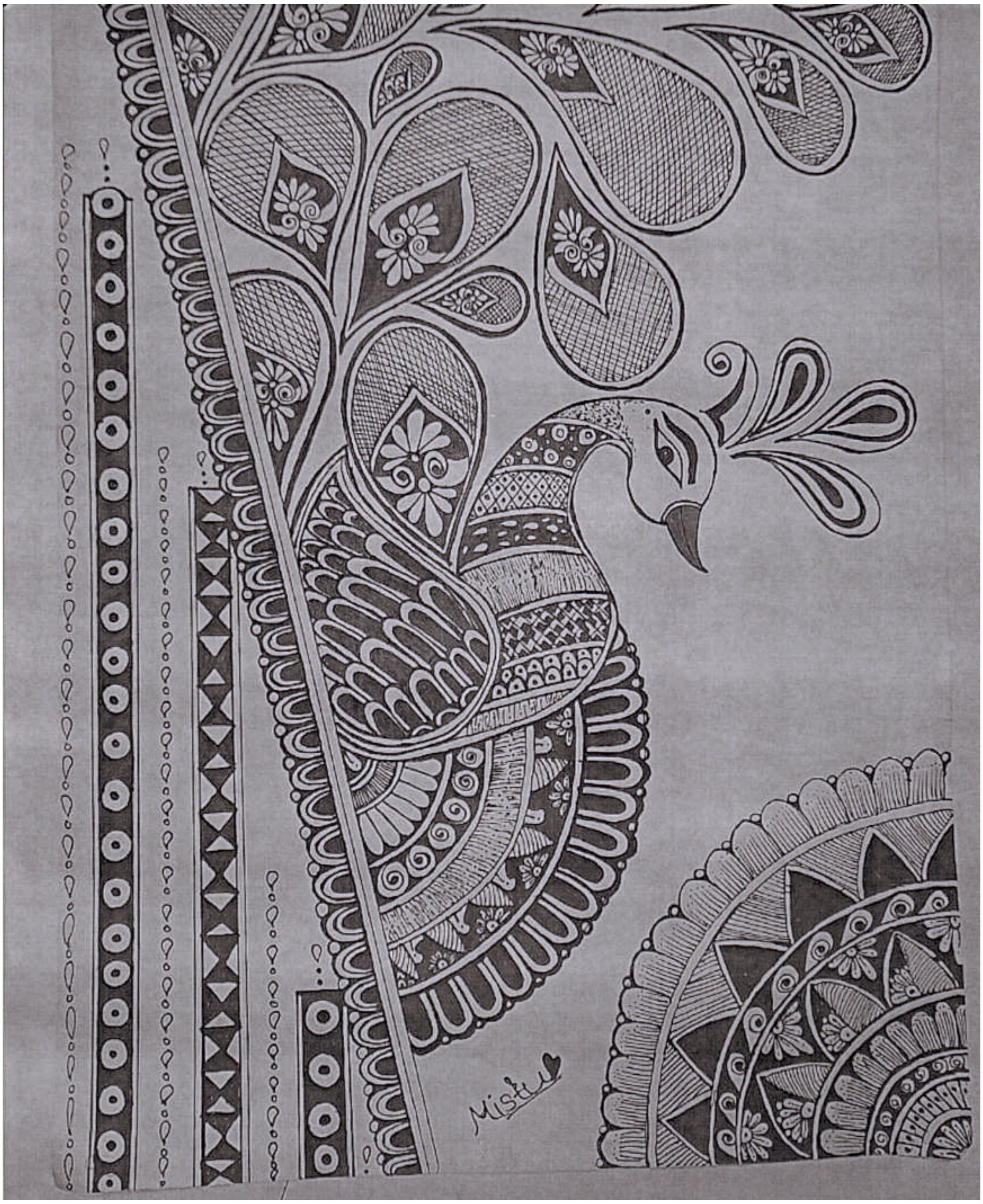

দিশা পোড়েল

চতুর্থ সেমেস্টার

সাধারণ স্নাতক

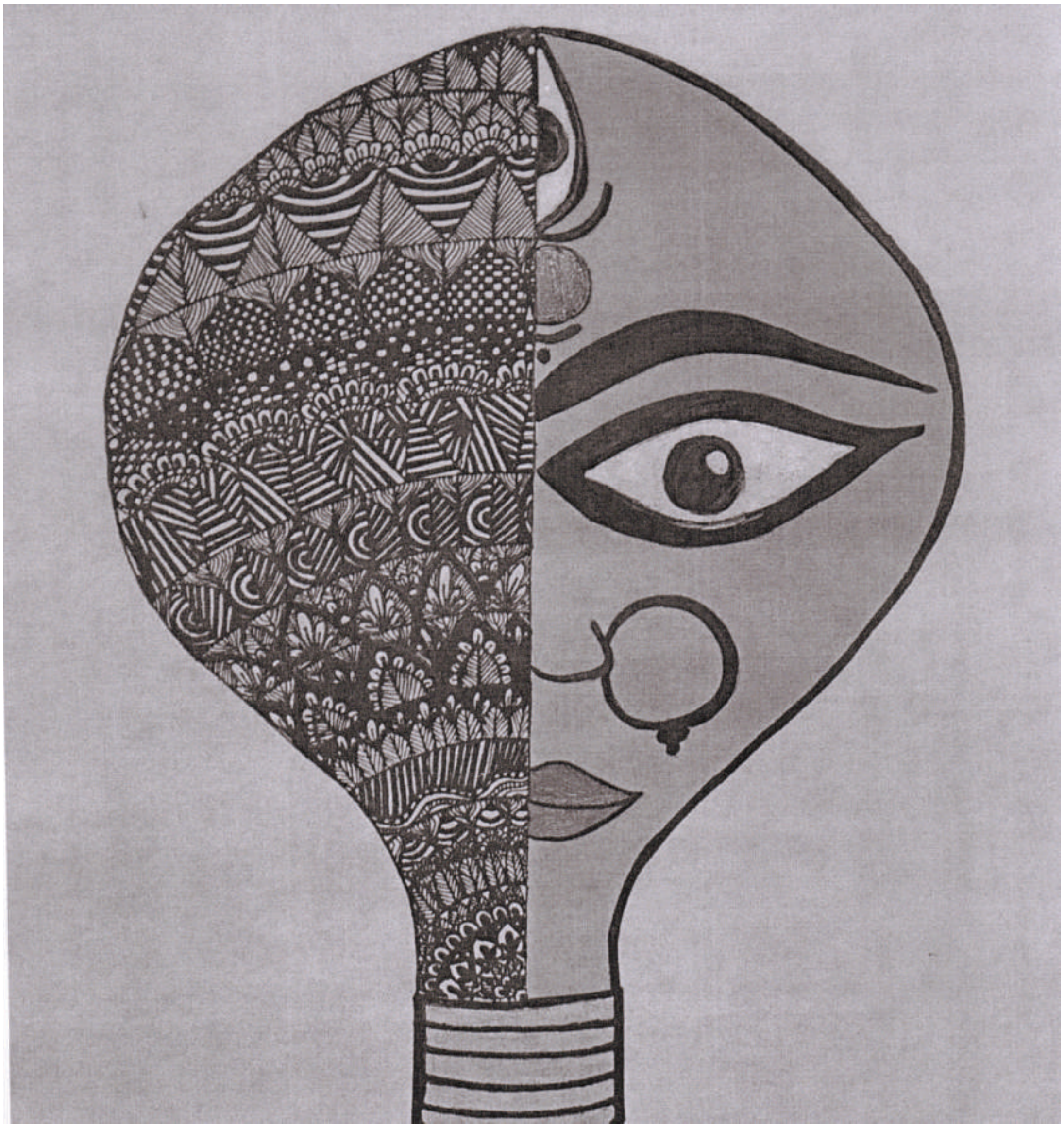

শ্রেয়া রাউত
প্রাক্তনী ছাত্রী
ইংরেজী বিভাগ

শ্রেয়া পাত্র

প্রথম সেমেস্টার

ইংরেজী বিভাগ

প্রিয়াঙ্কা খিলাড়ি
প্রথম সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ